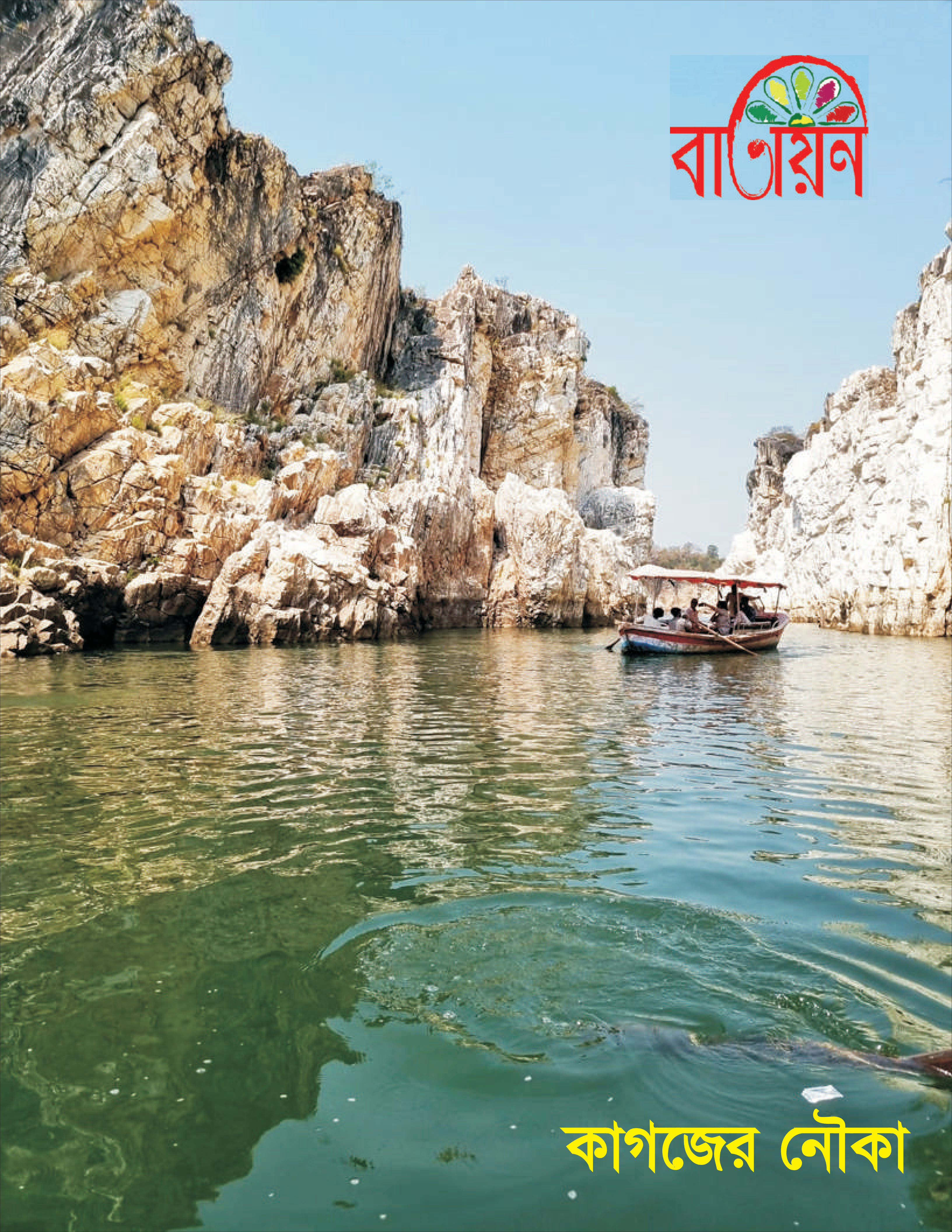
বাতায়ন
কাগজের নৌকা

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২৮তম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৫

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 28 : August, 2025

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Chief Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee, CEO

Photo & Artwork Credit

Amit Rudra — **Front Cover**
Perth, Australia

Amit is a retired academic who taught and researched for over three decades in various areas of Data Science - data mining, business intelligence and enterprise systems. Although he has a couple of books and several research articles to his credit he is an avid globe trotter who has visited or lived in nearly three dozen countries in almost all inhabited continents of the world. Of all the things in nature, the smell of sulphur from volcanoes, water and open vehicle jungle safaris attract his passion. He spends his time as a Digital Mentor for seniors and wood turning creating exotic designs.

Saumen Chattopadhyay — **Front Inside Cover**
IL, USA

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Supratik Mukherjee — **Title Page & Back Cover**
Perth, Australia

সুপ্রতীক মুখার্জী । পার্থিব বাসিন্দা । প্রজ্ঞা-পিয়াসি ।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বহু জাহাজের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। "মেফ্লাওয়ার" যেমন ইংল্যান্ড থেকে ম্যাসাচুসেটস গিয়ে নতুন ভূখণ্ডে আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছিল, "এন্ডেভার", "সান্তা মারিয়া" যেমন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অজানা মহাদেশের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল, তেমনি সাহিত্যও আমাদের চেতনার মানচিত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। এন্ডেভারের হাল ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন কুক কিংবা সান্তা মারিয়ার হাল ধরেছিলেন কলম্বাস, কিন্তু প্রতিটি অভিযানে ছিল নাবিকদের সম্মিলিত শক্তি। কাগজের নৌকা তেমনই এক জাহাজ, যার দিকনির্দেশ লেখকেরা ঠিক করেন, আর পাঠকেরা সেই যাত্রায় সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

প্রকাশিত হলো কাগজের নৌকার আঠাশতম সংখ্যা। প্রতিবারের মতো এবারেও কাগজের নৌকা নিয়ে এসেছে দেশ বিদেশের লেখক লেখিকাদের সৃষ্টিকে। ভৌগলিক দূরত্ব তাদের লেখার সৃজনশীলতাকে ম্লান করতে পারেনি, কারণ প্রতিটি লেখাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রবাস মানে বিচ্ছেদ নয়, বরং অন্য আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে নিজের শিকড়কে নতুনভাবে দেখা। কবিতা হোক বা গল্প, প্রবন্ধ হোক বা স্মৃতিকথা, কাগজের নৌকার এই সংখ্যার সবখানেই ছড়িয়ে আছে জীবনের বহমানতা, সময়ের টানাপোড়েন আর ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা। কাগজের নৌকার আঠাশতম সংখ্যা তাই শুধু সাহিত্যপাঠ নয়, এটি এক বহুমাত্রিক যাত্রাপথের দিনলিপি।

সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে ২০২৫এর এমন একটি ঝোড়ো প্রেক্ষাপটে, যখন বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি, রাজনীতি, অভিবাসন কিংবা পরিবেশ, সবকিছুই আমাদের সমষ্টিগত জীবনকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে। এমন সময়ে সাহিত্য ও ভাবনা কোনো বিলাসিতা নয়; বরং একান্ত প্রয়োজন। এগুলোই আমাদের শেকড়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, বর্তমানকে বোঝার আলো দেয় এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ করে।

মেঘমেদুর বর্ষা পেরিয়ে শরতের আকাশ এখন নীল। কিছুদিন পরেই বাংলার আকাশ বাতাস ভেসে যাবে ঢাকের আওয়াজে, দুর্গোৎসবের রঙিন আলোতে। দুর্গাপুজো আপামর বাঙালির কাছে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, বরং মিলনের উৎসব, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার উৎসব, যেন শেকড়ের টানে ফিরে আসার মতো।

ইতিহাসের বিখ্যাত নাবিকেরা যেমন ঝোড়ো সমুদ্রের মাঝেও সাহস ধরে রেখেছিলেন, তেমনি কাগজের নৌকার লেখক লেখিকারাও শব্দের পাল তুলে এগিয়ে চলেছেন সময়ের ঝড় পেরিয়ে। অশুভকে পরাজিত করে শুভের জয় দিয়ে দুর্গোৎসব আমাদেরকে শেখায় অন্ধকার থেকে আলোর পথযাত্রী হতে। কাগজের নৌকার এই যাত্রাও সেই আলোর পথের দিশারী হয়ে উঠুক এইটুকুই প্রার্থনা।

আশা রাখছি এবারের কাগজের নৌকার আঠাশতম সংখ্যাটি পাঠকের মনে প্রতিবারের মতো নিজগুণে স্থান অর্জন করবে। কাগজের নৌকার সকল লেখক, লেখিকাদের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা, আর পাঠকদের আহ্বান জানাই যে আসন্ন দুর্গোৎসবের আগমনী সুরে আসুন একসাথে যাত্রা শুরু হোক নতুন সাহিত্য-সমুদ্রে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

বাতায়ন

সূচীপত্র

কবিতা

তপনজ্যোতি মিত্র	**নতজানু ঈশ্বর**	5
সুরঞ্জন চ্যাটার্জী	**ভাল গানের আসর**	6
সুরঞ্জন চ্যাটার্জী	**গৃহপ্রবেশ**	7
মলি সিদ্দিকা	**অধরা**	8

গল্প

ঊর্মি চক্রবর্তী	**একাকীত্ব**	9

ধারাবাহিক গল্প

প্রতীপ ভট্টাচার্য	**ভবানীপুর** (প্রথম পর্ব)	12
	স্কুল, বিনোদন (দ্বিতীয় পর্ব)	17
শাশ্বতী বসু	**পিজা পাস্তার দেশে "জলের শহর ভেনিসে"**	22

ধারাবাহিক উপন্যাস প্রবন্ধ

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	**ছায়া সীমানা**	30
স্বপ্না মিত্র	**পাহাড় চুড়ো**	46

বাতায়নের পথ চলা	59
Book Review	63

তপনজ্যোতি মিত্র

নতজানু ঈশ্বর

নতজানু ঈশ্বরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে দীনতম মানুষ,
কান্না ভেঙে – বলে ওঠো ঈশ্বর, উঠে দাঁড়াও।
ঈশ্বরের নিমীলিত চোখ খুলে যায়,
মানুষের এই ম্লানতম পৃথিবীর কাছেই তো তাঁর ফিরে আসা।

ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেন সেই মানুষটিকে – তুমি কি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছো?

সে, সেই দীনতম মানুষ – কি করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে?
অপরিসীম পরিশ্রমে বেঁকে গেছে তার শরীর।
ঈশ্বর বলেন – তুমি যেদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন আমি উঠে দাঁড়াবো।

তখন কোথায় ডাক ওঠে – বান আসছে নদীতে,
প্রবল জলস্রোত এসে ভাসিয়ে দেয় জীবন।

পড়ে থাকে শোক, হাহাকার,করুণতম দুঃখমালা –

হাতেহাত ধরা দীনতম মানুষ আর নতজানু ঈশ্বর
কখন একসাথে বানভাসি হয়ে যায়।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

সুরঞ্জন চ্যাটার্জী

ভাল গানের আসর

শুনতে পেলাম, হবে নাকি ভাল গানের আসর
ঐ বহু দূরে, শ্রী তপো চন্দ্রের আস্তানায়-
হেঁটে রাস্তাঘাট পেরোতে লাগে ৭ ঘণ্টা ।
একটানা পায় হেঁটে গেলে প্রায়ই হাত পা ভাঙে
খুবই ভাবছি হেঁটে যাবো কি ?
এমন সময় ভায়া রবীন সিকদার
দরজায় দাঁরায়ে হাঁকে
সাথে তার অক্সফোর্ডটি
বলে হেঁকে গান তো করবে ভায়া
রাস্তা বড়ই দুর্গম,
তোমার জন্য ভেবে চিন্তে
তাইতো আলবোলায় দিলাম দম।
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ দমের পর
মাথার চিন্তা হলো বন্ধ
সাথে সাথে মনে এলো তোমারি গানের ছন্দ
"মনমে কভিঃ দুঃখ না পৌঁছা
কহি যান না মিলেতো
ভয়েল গাড়িমেই চলনা"
আর দেরি না করে
উঠে পড়লাম সিকদারের গাড়িতে
সাথে নিলাম হারমনিয়াম তবলা বাঁয়া
ভাঙ্গার ভয়ে বিচুলীর বস্তাতে।
চলছে গাড়ি অক্সফোর্ড টি, একাৎ ওকাৎ করাৎ
হঠাৎ গাড়ি কাৎ হলো, সবাই প্রায় কুপোকাত
লাফিয়ে নাবলাম সবাই জোড়হাত লাগালাম
গাড়ি ওঠার জন্য, চালক লাগায় জোর লাঠি
ভঁইস দুটো লাফিয়ে ছোটে ছিটকে যায় পুরো গাড়িটি
তবলা হারমনিয়াম পড়লো ছিটকে যায় পুরো গাড়িটি
তবলা হারমনিয়াম পড়লো ছিটকে বাঁধের ঢালে,
আমার গানের ছন্দের তালে,
গড়িয়ে চললাম প্যাঁক প্যাঁকালে
হাঁকপাঁক করে কোন রকমে
আটকালাম বস্তা কসরৎ ঢঙ্গে
অন্ধকারে সিকদার হাঁকে চীৎকার করি
আমায় বাঁচাও এবার হরি
ভালো গানের আসরে আর যাবনা
পূর্বপুরুষের এ অক্সফোর্ড চড়ি।
আমার অবস্থা আরও সঙ্গীন
ঘুচে গেছে আমার গানের স্বপ্নরঙিন,
মাটির বাঁয়ার ভগ্নদশা তবলা হয়েছে বিশ্রীফাঁসা
হারমনিয়ামের রীড গুলো
চিৎ হয়ে বাঁধের ঢালে পড়ে আছে
ভালো গানের আসরে যাচ্ছি
তাই ওরা যেন কৌতুকে হাসছে।

ব্যাঙ্গালোর বাসি **সুরঞ্জন চ্যাটার্জি** Geological Survey of India তে বহু বছর চাকরি করেন। Land Survey এর কাজে উনি দেশের অনেক রিমোট জায়গায় কাজ করেছেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Dandakaranya, Darjeeling, Garo Hills, Bihar, Tamil Nadur Vaniyambadi, Jolarpet আর Andaman এর Barren Island volcano. পরবর্তীকালে উনি ওনার অভিজ্ঞতার উপর base করে কিছু গল্প ও কবিতা লিখেছেন। তারই কিছু এখানে আপনাদের সাথে share করা হল।

সুরঞ্জন চ্যাটার্জী

গৃহপ্রবেশ

নিমন্ত্রণ পেলাম পেলারামের গৃহপ্রবেশ হবে
যাকযজ্ঞ গান বাজনা গ্রাম শুদ্ধ সবাই খাবে।
খাওয়া হবে মিঠাই মণ্ডা, সাথে থাকবে আটবণ্ডা
তারপর হবে মহাছত্র ভিক্ষারিদের
কারণটা শুধু গৃহ প্রবেশ নয় আরো কিছু আছে কারণ
সেই সব কথা বলতে গেলে, পেলারাম করবে বারণ।
পেলারামের শালার শালা, তার ঐ মাসতুতো খুড়ো,
ঐ নন্দী গ্রামে হয়েছেন যিনি, সবার ইচ্ছায় গ্রাম বুড়ো।
সেই গ্রাম বুড়োর সাহায্য নিয়ে, পেলারাম করবে দোকান
ঐ নন্দী গ্রামের সবার ইচ্ছা, এই কারণে নিমন্ত্রণ খান।
তাইতো পেলারাম এতো করছে, অনেক ভেবে চিন্তে
তারও যে কারণ লুকিয়ে আছে, কেউ পারবে না জানতে।
হঠাৎ পেলারামের এতো টাকার, মালিক হল কি ভাবে
এসব প্রশ্ন উঠলে পরে আমি কাটবো নীরবে।
কারণটা আমার সব জানা, আর কেহ নাহি জানে
সুত্র ধরে খুঁজতে গেলে বিশ্রী ব্যাপার হবে।
পেলারামের শ্যালক হচ্ছে নামকরা ড্রাগ trafficar
পুলিশ থেকে বাঁচবার তরে পেলারাম কে করলো ক্যাশীয়ার।
যখনই পুলিশ করতো তাড়া, পেলারাম দিত ঘুষ
নোটের তোঁড়ায় হতো পুলিশ কাঁৎ, আইনের হাত হতো ফুঁস।
তারপারে চাঁদনি চকের মোড়ে, যেটা সেরা দোকান
সব পাওয়া যায় কিনতে, শুধু চাইবে না কিনতে পান,
পান চাইলেই পেলারাম, করবে তোমায় সন্দেহ
সাথে সাথে ডাকবে ভিতরে, লোক দিয়ে বিশাল দেহ।

মলি সিদ্দিকা

অধরা

কবিতা,
তুমি ঘুমতে দাওনি
বহুদিন তোমার মায়াবী মুখ
কণ্ঠের জাদু আর নূপুর পায়ের ছন্দ
বার বার টেনে নিয়ে যায়
কল্পনার পাখায় ভর করে
অচেনা এক দেশে
সবুজ ঘাসের কার্পেটে
মৃদু পায়ে ছন্দে
হেঁটে যাই বহুদূর
তোমার সুর তোলা বাঁশিতে
ফিরে পেলাম কি অলিন্দ?
কবিতা,
তুমি বড্ড মায়াবী
খুব বেশি অপার্থিব
তোমার টানে কেউ গৃহহীন
আবার কেউবা গৃহী
কবিতা,
তুমি শিল্পীর তুলিতে কি আঁকা?
কখনো গ্রামাফোনে বেজে ওঠো মধুর সুরে
কবিতা,
তোমার বাচনে রেখো আমায়
অধরা আমাকে বেঁধে নিও
বেঁধে রেখো মায়ায়!!

মলি সিদ্দিকা – শিল্প, সাহিত্য এবং মানবতাপ্রেমী লেখিকা মলি সিদ্দিকার একক কবিতার বই "বুনো আঁধার" প্রকাশিত হয় নন্দিতা প্রকাশ থেকে। সাম্প্রতিককালে কবিতায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে ম্যাগাজিন এবং সংকলনে। তাঁর কবিতা অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে স্প্যানিশ ভাষায় কার্ডিনাল রেভিস্টা লিটেরিয়ায় এবং ভারতের উড়িয়া ভাষায় মাহুড়ি ম্যাগাজিনে। মানবাধিকার বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন কবি অস্ট্রেলিয়া থেকে এবং বর্তমানে সরকারি চাকুরী করছেন। বিষয়ের ভিন্নতাসহ সমাজ এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন কবি তাঁর লেখায় পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে।

ঊর্মি চক্রবর্তী

একাকীত্ব

"Desire" বাড়ির নাম – Aged Care – গেটের দু পাশে বাঁকসিয়া আর জ্যাকারান্ডা ফুল থোকায় থোকায় ফুটে আছে। যদিও বছর দুয়েক ধরে রোজ এই বাড়ির পাশ দিয়ে সকালে হাঁটি তাই লক্ষ্য করেছি যে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক – মুখে মিষ্টি হাসি, চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা, পরনে সাদা কালো চেকচেক শার্ট, বাদামী প্যান্ট, হালকা দাঁড়ি – গেটের পাশে দাঁড়াতেন। আমি ওখান দিয়ে যখন হেঁটে যেতাম তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে মনে হতো যে উনি কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন সেটা ওনার চোখের দৃষ্টিতে বুঝে যেতাম। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে জানলার ধারে বসে থাকতে দেখতাম। গত দু দিন ওই একই পথ দিয়ে যখন হেঁটে যাই তখন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ওখানে দেখতে না পেয়ে আমার খুব কৌতূহল হল। আমি ভাবলাম যে একবার গেট টা খুলে দরজার পাশে কলিং বেল বাজিয়ে দেখি যদি কেউ দরজা খোলে। যদিও খুব একটা আশাবাদী ছিলামনা তাও ভাবলাম যে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

মিনিট খানেক পর একজন মাঝ বয়সী মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন "Hello I am Shannon. How can I help you today?" আমি উত্তরে বললাম যে "Hi Shannon. Hope you are doing good. I used to see an old gentleman near the gate for almost a year while doing morning walk but I couldn't see him for last couple of days so thought of inquiring about him though I do not know him personally"। এই কথাটা বলাতে খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন আর বললেন যে এইভাবে ভেতরে ঢোকার নিয়ম নেই। কিন্তু আমাকে দেখে খুব সহজ সরল মনে হলো বলে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন Shannon। আমি যার কথা উল্লেখ করেছিলাম সঠিক ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলেন আর বললেন যে "Jonathan, someone has come to see you"। আমি দেখি যে উনি হুইলচেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছেন। Shannon বললেন যে ওনার বয়েস যদিও ৮৫ কিন্তু নিজে সব কিছু করতেন তবে সপ্তাহ দুয়েক

আগে বাথরুমে পা স্লিপ করে পরে যাওয়ায় কোমরের হাড় ভেঙে যায় আর হুইলচেয়ার ছাড়া হাঁটতে পারেননা সেই কারণে ঘর থেকে বেরোননা । Shannon আমাকে একটা চেয়ার দিলেন বসতে। Jonathan কে আমার পরিচয় দেয়াতে ওনার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগলো। আমাকে বললেন "তুমি একজন অচেনা হয়েও আমাকে গেটের পাশে না দেখতে পেয়ে আমার খোঁজ নিতে এলে?" তখন Jonathan নিজের কথা বলতে শুরু করলেন "আমার স্ত্রী চার বছর আগে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়াতে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার একটাই ছেলে কিন্তু ও ভারমুক্ত হওয়ার জন্য আমাকে এই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেল আমার স্ত্রী চলে যাওয়ার পর। সেই যে রেখে গেল আর বললো যে সপ্তাহে এক দু বার এসে দেখে যাবে। কই আর ছেলের দেখা নেই, না কোনোদিন এলো গত চার বছরে না একবার ফোন করে বাবার খবর নেয়ার কথা মনে পড়লো।" আমি বাবা তো ... তাই মনে হত যদি ছেলে আসে দেখা করতে তাই রোজ সকালে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম।" আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে আর তখন বললাম যে "Jonathan আমি মাঝে মধ্যে চলে আসবো আপনার সাথে গল্প করতে।" আমার কথাটা শুনে বললেন "God bless you my child. You are more than welcome।"

Shannon আমার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে এলেন আর Jonathan কে হাসতে দেখে বললেন যে বহু দিন পর আজ এইরকম মন খুলে হাসছেন। আমি তখন বললাম যে Jonathan এর মধ্যে দিয়ে আমার নিজের দাদুকে খুঁজে পেলাম যিনি আমার সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন কিন্তু ৩০ বছর আগে lungs ক্যান্সার হওয়ায় চলে গেলেন আর সেই শূন্যতা মনে হলো যেন আজ পূর্ণ হলো।

আমি কফি শেষ করে কাপটা রাখতে গিয়ে Shannon এর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি যে Shannon dining room এ বসে bread butter, omlet আর fruit salad খাচ্ছে। আমি পাশে গিয়ে বসলাম আর জিজ্ঞেস করলাম কতদিন হল Desire এ কাজ করছেন? উত্তর দেয়ার আগেই কাঁদতে শুরু করে দিলেন। আমি বললাম যে "আপনার মনের কথা আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।" তখন Shannon বললেন যে তিনি কলেজ শেষ করার আগেই একটি গ্রিক ছেলের প্রেমে পড়ে যান আর ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বছর দেড়েক পর জমজ ছেলে হয়। Simon এর ব্যবহার ক্রমশঃ খারাপ হয় – Shannon কে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে আর সেটা সহ্যর বাইরে হয়ে যায়। পুলিশ কে রিপোর্ট করে domestic violence এর আর দুই ছেলেকে নিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেন।খুব কষ্ট আর পরিশ্রম করে একাই দুই ছেলেকে বড় করেন। ১৬ বছর ধরে এই বৃদ্ধাশ্রমে কাজ করছেন আর নিজের দুঃখের পাহাড়কে ভোলানোর জন্য এই কাজের সাথে যুক্ত হন। তাছাড়া এখন ওনার দুই ছেলে ১৮ বছরের ওপর বয়স তাই ওরা নিজেদের মতন থাকে আর মাসে এক দু বার ফোন করে তবে Shannon কে দেখতে আসেনা ছেলেরা। কথা বলতে বলতে Shannon এর একটা ফোন আসে তাই "excuse সব" বলে কথা বলতে অন্য ঘরে চলে যান।

আমি dining room থেকে উঠে দরজা দিয়ে একটু বেরিয়ে দেখি বিল্ডিংটা খুব সুন্দর সাজানো আর মনটা আনন্দে ভরে গেল নানা রঙের ফুল দেখে- কি নেই? লাল গোলাপ, সাদা ও হলুদ জবা, চাপা, ডালিয়া, মারায় ফুলের গন্ধে চারিদিক মম করছে এবং বিভিন্ন ধরনের পাতা বাহারি আর তার সাথে খুব রেয়ার ক্যাকটাস গাছ। মারায় ফুলের গাছে মৌমাছির উড়ে বেড়ানো ও রঙিন প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বসছে এই মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি ভাবলাম – এতো সুন্দর সাজানো বাগানে এসে বসলে শরীর অর্ধেক ভাল হয়ে যাবে যেকোন মানুষের। Shannon ফোন শেষ করে খুঁজে ঠিক আমার কাছে আসেন আর বলেন যে আমাকে বিল্ডিং টা ঘুরে দেখাবেন। উনি যে আমার মনের কথাটা বলে ফেললেন এতে আমি খুব খুশি হলাম।

একটু দূরেই দেখি সেই বৃদ্ধা মহিলা যাকে জানলার পাশে বসে থাকতে দেখতাম walker নিয়ে ঘরে হাঁটছেন। আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম Shannon কে "এই বৃদ্ধা মহিলা walker নিয়ে হাঁটছেন – ওনাকে আমি রোজ জানলার পাশে বসে থাকতে দেখতাম।" এই কথা শুনেই Shannon বললেন যে "এসো ওনার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাই আর ওনার সাথে পরিচয় করিয়ে দি।" ঘরে গিয়ে ওই বৃদ্ধা মহিলার সাথে পরিচয় করলাম। উদ্ভাসিত মুখ, হালকা নীল রঙের টপ আর

মেজেন্টা রঙের প্যান্ট পড়ে ছিলেন, মাথার ওপর চশমা তোলা, একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন "হ্যালো আমার নাম Melissa।" দেখে মনে হল বয়েস ৯০ এর ওপর হবেই তবে চেহারার মধ্যে সেই উদাসীন ভাব আর চোখ যেন কথা বলছে। Shannon ওনার সাথে পরিচয় করানোতে আমাকে কাছে ডেকে এনে কপালে একটা চুমু দিয়ে বললেন "ভগবান তোমার মঙ্গল করুক আর তুমি জীবনে আরো অনেক উন্নতি করো।" ওনার দুঃখ কষ্ট সব কিছু আমাকে বললেন – আজ থেকে বছর দশেক আগে bushfire এ উনি ওনার স্বামী ও একমাত্র মেয়েকে হারান। সেই সময় তিনি বোনকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন কেননা বোনের heart surgery হয়েছিল। সপ্তাহ খানেক বোনের সাথে থাকার পর যখন বাড়ি ফিরে আসেন, দেখেন যে বাড়ি পুড়ে ছাড়কার আর কেউ বেঁচে নেই। উনি একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে একজন ভদ্রলোক ওনার বাড়ির কাছেই থাকতেন এসে ওনাকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে গেলেন। জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর মনে করেন যেন ওনার স্বামী Craig ওনার সাথে কথা বলছেন।

Melissa নিজের কথা শেষ করার সাথেই ওনার ঘরে লাঠি নিয়ে আসতে আসতে হেঁটে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঢুকে পড়েন আর বলেন "এটা আমার রুম ... তোমরা কে? আমার রুমে কি করছো ?" খুব উচ্চস্বরে বলেন আর সেই মুহূর্তে Shannon দৌড়ে আসে আর তখন ওনাকে শান্ত হতে বলেন আর হাত ধরে ওনার ঘরে নিয়ে যান। আমাকে তখন Melissa বলেন যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম হল Carlos আর উনি ডিমেনশিয়া তে ভুগছেন গত তিন বছর ধরে। বহুবার তিনি নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন আর ওনার যেহেতু কিছু মনে থাকেনা তাই বাড়ির ঠিকানা মনে না থাকায় রাস্তায় লোকজন কে জিজ্ঞেস করেছেন "আমার বাড়ি কোথায়? আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দাও।" ওনার পকেট থেকে pensioner card পেয়ে ওনাকে যথাস্থায়ী জায়গায় পৌঁছে দেন অচেনা লোকজন। এইরকম বেশ কয়েকবার হওয়াতে Carlos এর ভাই সিদ্ধান্ত নেন যে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয়াটা দাদার জন্য সঠিক হবে। নিজের নাম ও পরিবারের কারোর কথা মনে নেই Carlos এর। মনে রাখতে পারেনা নিজের ঘর কোনটা তাই অন্যদের ঘরে ঢুকে দাবিদাবা করেন যে ওটাই ওনার ঘর। Carlos এর কোন সন্তান নেই আর স্ত্রী skin cancer এ মারা যাওয়ার পর উনি এই ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ওনার ভাই এসে Desire তে দিয়ে যায়।

কয়েক ঘন্টা কি ভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। Melissar ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখি খানিক দূরে কোরিডোর এ চেয়ারে বসে উলকাটা দিয়ে সোয়েটার বুনছেন। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম যে চশমা ছাড়া কি নিখুঁত ভাবে সোয়েটার বুনছেন একাগ্রতা সহ! গায়ে হালকা হলুদ রঙের ছোট্ট ছোট্ট টিউলিপ ফুলে প্রিন্ট করা গাউন পরে আছেন। ওনাকে দেখে মনে হল যেন আমার ঠাম্মা কে জলজ্যান্ত দেখতে পারছি। আমার ঠাম্মা চশমা ছাড়া সোয়েটার বুনতো আর চেহারার সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি কি এখানে নতুন জয়েন করেছ?" আমি উত্তর দিলাম যে "আমি Shannon এর বন্ধু"। উনি বললেন "আমার নাম ফিওনা আর আমি এখানে আট বছর ধরে আছি। আমার পার্টনার একসিডেন্টে মারা গেছেন আর আমার এক মেয়ে সে কানাডা তে থাকে!

একেক জনের একেক রকম রোগ এবং দুঃখ কষ্ট দেখে মনটা খুব ভারী হয়ে গেল আর সেই সময় এটাই কল্পনা করলাম যে একদিন আমারও কি একই পরিণতি হবে?

একাকীত্ব বৃদ্ধ বয়সে একটা অভিশাপ। আমরা সবাই একদিন বৃদ্ধ হব তাই চেষ্টা করা যে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও তাদের অভিজ্ঞতা ও সুখ দুঃখের গল্প শোনা ও আলিঙ্গন করা। তারা মন খুলে কথা বলতে পারবেন, জীবনের একাকীত্বর সাথে তারা যেনো দুঃখের স্রোতে ভেসে না যান সেটা একান্তই চেষ্টা করাটা প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি।

Urmi Chakraborty presently lives in Sydney. She has a great passion for travelling and love to explore new places, avid reader of english novels. She wrote numerous hindi poems and english articles in facebook and different blogs. She is extremely happy to share her creation with Batayan's readers.

প্রতীপ ভট্টাচার্য

ভবানীপুর

প্রথম পর্ব

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক। পিতা বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোরতর আকার ধারণ করেছে, সে যুগের অখন্ড ভারতব্যাপী অসংখ্য ছোট, মাঝারী ও বড় শহরগুলিতে সৈন্যনিবাস অথবা ক্যান্টনমেন্ট এবং তৎসংলগ্ন হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। পিতার চাকুরীর সুবাদে আমাদের এইরূপ কত শহরে যে বাস করতে হয়েছে তার সংখ্যা হারিয়ে ফেলেছি। তবে কোন জায়গাতেই এক বা দেড় বছরের অধিক বাস করতে হয় নি, ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তনের নির্দেশ এসেছে।

তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। বাবা বদলি হলেন ফতেগড় নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে, কানপুর থেকে ৯০ মাইল দূরে। কানপুর রেল স্টেশনে নেমে জীপগাড়ীতে ফতেগড় পৌঁছোতে হত। মনে পড়ে কানপুর স্টেশনে দ্বিতলে বিশ্রামকামরায় রাতযাপন করা। ঐ স্টেশনেই আমার জীবনের প্রথম লিফট চড়া, খাঁচার মতো লৌহজালে ঘেরা সেই উত্তোলন যন্ত্রে দ্বিতলে আরোহণ করা কালে আমি আনন্দ-উত্তেজনায় সচিৎকারে লাফালাফি করেছিলাম মনে আছে। বাবা-মা সন্ত্রস্থ হয়ে আমাকে নিরস্ত করেছিলেন, তখন বিদেশী শাসন, স্টেশনে একাধিক লালমুখো অফিসারদের বিচরণ, তাঁদের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়। ফতেগড় একটি ধূলিপূর্ণ, গরম ও অপরিষ্কার জায়গা হিসাবেই আমার ম্লান স্মৃতিতে স্থান পেয়েছে। আর একটি ঘটনা মনে খুব রেখাপাত করেছিলো, সেটি হলো একটি ইংরাজ সামরিক দম্পতির বাড়ী আমাদের সৌজন্যমূলক গমন। বৃটিশ ভদ্রমহিলাটি সস্নেহে আমাকে একটি সুন্দর রঙ্গীন গ্লাসে বরফ-ঠান্ডা অরেঞ্জ স্কোয়াশ পান করতে দিয়েছিলেন। আবার বিদায়ের সময় কয়েকটি রঙ্গীন পেনসিল উপহার পাওয়ার পর আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তুচ্ছ ঘটনা, সামান্য উপহার কিন্তু সেই স্থান, কাল ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাল্যমনে স্মৃতিটি চিরস্থায়ী হয়ে আছে। ফতেগড়ে আমাদের বাস এক বছরেরও অনধিক ছিল।

পরে আর একটি স্থানের নাম স্মরণে আসছে, পূর্ব বাঙ্গলার পার্বতীপুর। সেটি ১৯৪০-৪১ সাল, অর্থাৎ ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতার পূর্বে। মনে আছে সেখানে আগমনের পর উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে আমাদের একটি বৃহৎ তাঁবুতে কয়েকদিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল, আহার আসতো সেনাবাহিনীর ক্যান্টিন থেকে। পরে একটি ছোটো বাড়ী ভাড়া পাওয়া গিয়েছিলো। সেখানেই আমার প্রথম গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন স্থানীয় ছোটো স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। এখনো মনে আছে তাঁর বাংলা শিক্ষার কথা, আমার সেই ছয় বছর বয়সেই তিনি আমাকে মুখস্থ করিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলার একটি পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত কালিদাসের সেই মর্মস্পর্শী সাগর-বন্দনাটি –

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালবনরাজিনীলা
আভাতি বেলা লবনাম্বুরাশে
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখাটি

এই আট দশক পরেও আমার স্মৃতিতে উজ্জল!

পিতার প্রতিবার কর্মস্থল পরিবর্তনের সময় আমাদের কলকাতা আগমন অবশ্যাম্ভাবী হতো। মা এই উপলক্ষ্যে তাঁর পিত্রালয়ে কয়েকটি দিন, কখনো কখনো মাসাধিক সময়ও বাস করার সুযোগ উপেক্ষা করতেন না। সুতীক্ষ্ণ “কু” বাঁশী বাজিয়ে দৈতাকার বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ীটি হাওড়া স্টেশনে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের পুলক মিশ্রিত উত্তেজনা

চরমে উঠতো। কলকাতা যে আমাদের মাতৃভূমি, আমার জন্মভূমি, আমার রূপকথার নগরী, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, বিচিত্র যানবাহন, চোখ-ধাঁধানো বিপণী-পণ্যবীথি, প্রমোদভবনগুলি এবং পথে-ঘাটে যেন সদাব্যস্ত অগণিত জনসাধারণের ভীড় ... আমার বাল্যমনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো। অন্য সব শহর, যেখানে আমরা বাস করে এসেছি, কলকাতার তুলনায় কত দীন, হীন, নিস্প্রভ মনে হতো। তদুপরি এখানে অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, কত খেলার সঙ্গীর সঙ্গে পুনর্মিলন, কত হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-প্রমোদ! যেন সোনায় সোহাগা!

হাওড়া স্টেশনের সামনে ঘোড়ার গাড়ী

স্টেশন থেকে বেরোনো হলো। সারি সারি ঘোড়ার গাড়ী যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে, ট্যাক্সির সংখ্যা নগণ্য। ঘোড়ার গাড়ীগুলির আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথম শ্রেণীর গুলি সুন্দর পালিশ বা রং করা, আসনগুলি রেশমি কাপড়ে মোড়া নরম গদি বিশিষ্ট। কোন কোন গাড়ীতে আবার খড়খড়ির জানলাতে রঙ্গীন পর্দা ঝোলানো। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিও বিলাসবহুল না হলেও পরিষ্কার ও আরামপ্রদ। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর গুলির, যেগুলি সংখ্যায় অজস্র, অতি দীনহীন রূপ। কাঠের আসন, অপরিচ্ছন্ন অবয়ব, অর্ধভগ্ন লন্ঠনগুলি দেখে বিতৃষ্ণাই আসে, তবে এদের ভাড়া অন্য শ্রেণীর গাড়ীগুলির অর্ধেকেরও কম হওয়ার জন্য চাহিদাও বেশি। ঘোড়াগুলিও শ্রেণী অনুপাতে তারতম্য ... একেবারে পালক ও ঝালর সজ্জিত পক্ষীরাজ থেকে রাসভাকৃতি ছ্যাকড়া ঘোড়া! আমরা একটি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতেই উঠলাম, মালপত্র সব ছাতেই চালান হয়ে গেল।

তখন বেশিদিন হয়নি পুরোনো ভাসমান সেতু ভেঙ্গে নতুন ঝকঝকে ইস্পাতের হাওড়া ব্রীজ নির্মিত হয়েছে। আগের সেতুতে প্রচুর অসুবিধা ছিল, বিশেষতঃ বন্দরমুখী জাহাজের যাতায়াতের জন্য ভাসমান সেতুর মধ্যাংশ উন্মুক্ত করে স্থানান্তরিত করতে হতো, পরে সেটি আবার সংলগ্ন করে সেতুটি পুনর্গঠিত করতে হতো। এতে ঘন্টাখানেক সময় অপব্যয় হতো। এখন কারিগরীশিল্পের এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই আধুনিক সেতুটির নীচ দিয়ে বড় জাহাজও অনায়াসে গমনাগমন করতে পারে। সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ী গমনকালে মা প্রতিবার হাতজোড় করে ভক্তিভরে মা গঙ্গাকে প্রণাম জানাতেন, আর আমাকে বলতেন বাবার কাছে চেয়ে সিকিটা-আধুলিটা গঙ্গায় প্রণামী হিসাবে নিক্ষেপ করতে। এই সেতুটি অতিক্রম করতে যে কি ভালোই লাগতো!

গাড়ী পাথরে গাঁথা বন্ধুর স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে গিয়ে আউটরাম ঘাটে পড়লো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য রেড রোড সৈন্যবাহিনীর দখলে, সেটি অস্থায়ী রানওয়েতে পরিণত হয়েছে। সেখানে ছোট এক-প্রপেলারযুক্ত যুদ্ধবিমান অবতরণ করে ফোর্ট উইলিয়ামে থামতো। জনসাধারনের ওদিকে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব তেল-ঢালা মসৃণ রাস্তা গঙ্গার কিনারা দিয়ে আমাদের পথ। শরতের গাঢ় সুনীল আকাশের

রেড রোডে যুদ্ধ বিমান

প্রেক্ষাপটে ছিন্ন তুলোর মতো ইতস্ততঃ ভাসমান মেঘ, স্নিগ্ধ, শীতল মৃদুমন্দ গঙ্গার মলয়, রাস্তায় যানবাহনের বাহুল্যের অভাবে শব্দহীন নির্মল পরিবেশ, আমাদের অশ্বরথ দ্রুতগতিতে ধাবমান ... আহা, মধু, মধু, মধু! মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ... ! ঐ শ্বেতশুভ্র ভিক্টোরিয়ার চূড়া দেখা যায়! আর মস্ত এক গীর্জার মিনার। গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে সাদা সরীসৃপের মতো ট্রামগাড়ী চলেছে বেগবান। মাঝে মাঝে তার ঘন্টা বাজছে, ঢং, ঢং! চোখ ভরে দেখছি আমরা প্রিয়তম শহরের সেই অপরূপ রূপ, সাধ যেন আর মেটে না!

হরিশ মুখার্জি রোড। পাশে এক বিশাল হাসপাতাল, বাবা বলে দিলেন নাম, প্রেসিডেন্সি জেনারাল, কলকাতার বৃহত্তম হাসপাতাল দুটির একটি। শিখেদের মন্দির, কিছু অগ্রসর হয়ে হরিশ পার্ক, মিত্র স্কুল। তার পরেই তেইশ পল্লীর মাঠের বিপরীত রাস্তায় আমার কত আরাধ্য মামার বাড়ী! গেট দিয়ে প্রবেশের পর তিনতলা বিশাল হর্ম্যটির সামনের দীর্ঘ, প্রশস্ত বারান্ডার সামনে গাড়ী দাঁড়ালো। সেই বারান্ডার মাঝামাঝি জায়গায় দাদামশায় ডেক-চেয়ারে বসে তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে মামলার আলোচনা করেন। তাঁর দুই পাশে দুটি বৃহৎ টেবিল, তদুপরি স্তুপিকৃত দলিল-দস্তাবেজ। আমাদের নামতে দেখে তিনি সাদরে আহবান জানালেন ... অণু (মা'র ডাকনাম) এসেছিস, আয়, আয়! অনেকদিন বাদে স্নেহময়, অতি শ্রদ্ধেয় পিতার সঙ্গে আদরের কন্যার মিলন, সাশ্রুনয়নে প্রণাম, আশীর্বাদ, প্রীতিভরা অনুযোগ ... বাবা, আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন, বয়স তো হচ্ছে, খাটুনি কমান। বাবা ও আমি প্রণাম, কুশল জিজ্ঞাসা ইত্যাদির পর পেছনে গরুড় পক্ষীর মতো দন্ডায়মান। তারপর সহাস্য আদেশ হল, যা, ভেতরে গিয়ে সবার সঙ্গে দেখা কর, জলখাবার খা।

দাদামশায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা, প্রবীণ ও অতি বিজ্ঞ উকিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, বি এ পরীক্ষায় অতি ঈপ্সিত জগত্তারিণী মেডেল প্রাপ্তি ... যে পদকটি প্রবাদপ্রতিম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃদেবীর স্মৃতিতে সৃষ্ট, যেটির প্রাপক তালিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রবাহপ্রতিম মনীষীরা, সেই মেডেলটি আমি তাঁর কাছে দেখেছি, তিন ইঞ্চি ব্যাসের, আড়াই ভরি সোনার পদকটি দেখলেই শিহরণ জাগে! পরে ইংরাজি সহ তিনটি বিষয়ে এম এ, ও আইন পরীক্ষায় (বি এল) প্রথম স্থানাধিকারী। মেধার জন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অতি স্নেহপাত্র ছিলেন, অল্পসময় তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীটির অধীনে সহায়কের কাজও করেছেন।

পরে তিনি স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও ব্যাপক আইনজ্ঞানের জন্য ইংরেজ জর্জরাও তাঁকে মান্য করতেন ও আইন বিষয়ক কোন জটিল সমস্যার উদয় হলে তাঁকে নিজেদের নিভৃত চেম্বারে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর প্রণীত হিন্দু কোড বিল বিষয়ক আইন পুস্তকটি সে সময়ে আইন ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। শুনেছিলাম প্রধান বিচারপতি ওঁকে জজিয়তির প্রস্তাব দেন, সেটি তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। এই অত্যুচ্চ সম্মান গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়া সেই সময়ে একটি অকল্পনীয় পদক্ষেপ, ফলে হিতৈষী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁকে প্রচুর আক্ষেপ, গঞ্জনা ও অনুযোগ শুনতে হয়। কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল অকাট্য। তিনি কারণ দেখালেন যে তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র, আট কন্যা, তাঁর ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল অনেকগুলি অভাবী, দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন,

এক ডজন পরিচারক-পরিচারিকা-গাড়ীচালক সহ তাঁর সুবৃহৎ সংসার। সর্বোপরি তাঁর আইন-ব্যবসায়ে নিযুক্ত সহায়ক ও কর্মচারীদের জীবিকার দায়িত্ব তাঁর। উপরন্তু তিনি মহা ধার্মিক ব্রাহ্মণ, বারো মাসে তেরো পার্বণ ছাড়াও তিনি তাঁর দেশের বাড়ীতে শারদীয়া দুর্গা পূজা অতি নিষ্ঠা ও আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেন। জর্জের বেতনে এতগুলি লোকের ভরণপোষণ ও সব ব্যয় অসম্ভব, কর্মচারীদের বাদ দিলেও। তাঁর আইনের খ্যাতি তখন মধ্যগগণে, তিনি তখন বড় বড় মামলা পরিচালনা করছেন, তাঁর এই সময়ের আয় ঈর্ষণীয়। এই আয় ত্যাগ করা অবাস্তব ও অবিমৃষ্যকারীতা। তাঁর কয়েকটি কন্যার বিবাহ দেওয়া তখনও বাকী, পুত্রদের শিক্ষা ও স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত ব্যয় বহন করাও। তিনি আরো কারণ দেখালেন জর্জদের অবসরগ্রহণ আবশ্যিক, কিন্তু ব্যবসায়ে অবসরের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, তিনি চান আমৃত্যু কর্মক্ষম থাকতে, যদি তাঁর শরীর কোন বাধা সৃষ্টি না করে। সমালোচনকারীরা স্তব্ধ হলেন। তাঁর সেই যুগের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় বা বন্ধুত্ব ছিল, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ... বাঁশবাগানে চাঁদ উঠেছে, কাজলাদিদি কই, সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটির লেখক ... তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, বহুবার কবিকে এই বাসায় আসতে দেখেছি। এক আশ্চর্য সমাপতনিক ভাবে এই দুই বন্ধুরই কন্যা একই দিনে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের উপরোধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কন্যাদের নামকরণ করেন উর্মিমালা ও উর্মিলা। এই শেষোক্ত জনই আমার কনিষ্ঠতম মাসীমা।

তখন কলকাতার বড় রাস্তা ব্যতীত সব রাস্তাই গ্যাসের আলোয় আলোকিত হত। লোহার স্তম্ভের ওপর চতুস্কোণ কাঁচের লন্ঠন, ভিতরে চুল্লি। প্রতি সন্ধ্যায় পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মই কাঁধে এসে লন্ঠনের জানলা খুলে চাবি ঘুরিয়ে গ্যাস জ্বালাতো, প্রথমে টিম টিম করে জ্বললেও পরে বেশ উজ্জ্বলই হতো। কাকভোরে এসে তারা সেই আলো নিভিয়ে দিতো। প্রতিটি রাস্তা দু বেলা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হতো। এর জন্য রাস্তার ফুটপাথে কিছুদূর ব্যবধানে গঙ্গাজলের (অপরিশ্রুত) হাইড্র্যান্ট থাকতো, কল খুললে প্রচন্ড বেগে জল নির্গত হতো। কর্পোরেশনের কর্মচারীরা বড় বড় দৈর্ঘ্যের বৃত্তাকারে পাকানো ক্যানভাস পাইপ কাঁধে ঝুলিয়ে এসে রাস্তা ধুতেন। যানবাহন তো কমই চলতো, কোনো অসুবিধা হতো না। আর ঐ হাইড্র্যান্ট থেকেই তাঁরা ঐ ফুটপাতেই রাখা ঢালাই লোহার বৃহৎ চৌবাচ্চাও ভর্তি করে দিয়ে যেতেন। এই রকম চৌবাচ্চা প্রায় সব রাস্তাতেই দু তিনটি করে রাখা থাকতো, ঘোড়ার গাড়ীর পিপাসার্ত ঘোড়ার জন্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ঘোড়ায় টানা ট্রামের সময় থেকেই এর প্রচলন। তখন কয়েকটি রুটের বাস ও ট্রাম ছাড়া যানবাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা ও সাইকেল। ট্যাক্সি মুষ্টিমেয় ছিল, তাদের দেখা মিলতো বৃহত্তম রাস্তাগুলিতেই। বড় লোকেদের ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী থাকতো, এবং বলা বাহুল্য, অধিকাংশই বৃটিশ উৎপাদিত। অস্টিন, ফোর্ড (ইংল্যান্ডের), মরিস, ভক্সল, উলসলে ইত্যাদিই বেশি দেখা যেত। দাদামশায়ের একটি বিশাল অষ্টিন গাড়ী ছিল। কিছু বনেদী বড় মানুষেরা তখনও নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী রাখতেন, তাও অনেক প্রকার ও শ্রেণীর ছিল ... ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, ফিটন, হ্যানসম ইত্যাদি। অস্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়ার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল।

সারা দিন ফেরিওয়ালারা মাথায় করে হরেক রকম জিনিস ফেরি করে বেড়াতো। পেতল-কাঁসার বাসনপত্র, গামছা, চাদর, গরমকালে মাটির কুঁজো-কলসি-হাঁড়ি, জয়নগরের মোয়া তো ছিলই তা ছাড়া শিল-কাটাই, ছুরি-বঁটি ধার দেনেওয়ালা, মুচি, তালা-চাবী সারাই, আরও কত কি। ম্যাগনোলিয়া, জলি চ্যাপ ও হ্যাপি বয় আইসক্রীমের হলদে ঠেলা গাড়ী আমাদের প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করতো, কাঠি সংলগ্ন ক্ষীরের আইসক্রীম খেয়ে যেন সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতাম। এক একটি ২ আনা দাম ছিল (ষোল আনায় এক টাকা হতো, চার পয়সায় এক আনা)। কাপের মূল্য অধিক, চার আনা। সেজন্য এটির চাহিদা কম ছিল। তবে কাঠি বরফওয়ালারও খুব বিক্রী ছিল, কাঠিতে বরফকুচির ওপর লাল সিরাপ দেওয়া, দু পয়সা দাম! সন্ধ্যা হলেই আসবে "চাই টাটকা জ্যান্তো তপসে মাছ", গরমকালে গন্ধে মাত করা বেলফুলের গোড়ে মালা ও সর্বশেষে আমাদের অতি কামনার ধন, লাল গামছা মোড়া মাটির হাঁড়িতে টিনের চোঙ্গায়, কুলপী মালাই! শালপাতায় এক আনায় একটা করে খেয়ে আমাদের ছোটদের কি আনন্দ! বড়রা কেউ কেউ আবার সিদ্ধির কুলপী খেতেন, সেটা কি বস্তু আমাদের জানা ছিল না, তবে সেটা যে এক মহার্ঘ আহার্য তা তাঁদের উল্লাস দেখেই বুঝতে পারতাম। আর সেটি যে ছোটদের নিষিদ্ধ সেটাও জানা ছিল।

আমাদের ছোটবেলায় রাস্তার খাবার খাওয়ার বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছিল। যখন স্কুল যেতে শুরু করলাম তখন লুকিয়ে চুরিয়ে শালপাতায় ঘুগনী, লেবুর রসে সিক্ত লবনাক্ত চাকা চাকা আলুকাবলি, খাবার সুবিধার জন্য একটি করে কাঠি গোঁজা, ছোলা সিদ্ধ ভাজা, হাসের ডিম সেদ্ধ, চিনেবাদাম ভাজা ইত্যাদি খুব চলতে লাগল। তবে আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল জনৈক উৎকলবাসিনীর রাস্তায় তোলা উনুনে তেলেভাজা ... আলুর চপ, মোচার চপ, বেগুণী, ফুলুরী, পেঁয়াজী ... সে স্বাদ এখনও যেন মুখে বিরাজমান! আমাদের এক দূর সম্পর্কের কাকার সঙ্গে গরমকালের ভোর বেলায় হাঁটতে যেতাম। তিনি খুবই দিলদরিয়া স্বভাবের ছিলেন, প্রায়ই কিছু না কিছু খাওয়াতেন। বিশেষ করে মনে আছে একদিন হাঁটতে হাঁটতে জগুবাবুর বাজারের বিপরীত ফুটপাতে দ্বারিক ঘোষের দোকানে বসে গরম গরম লুচি-মিষ্টি মিষ্টি ছোলার ডাল খাইয়েছিলেন প্রাতঃরাশ ... বিমোহিত হয়ে ভেবেছিলাম, আহা কি খাইলাম! সে খাবার যেন মাছ – মাংস – পোলাও – কালিয়ার চেয়েও সুস্বাদু লেগেছিল। পাশেই ভীম নাগের আবার খাবো সন্দেশ খেয়ে আমি যেন সেই কাকার চির বশীভূত হয়ে গেলাম। টফি-চকলেট খেতে মা মাঝে-মাঝেই পয়সা দিতেন, নেসলের (আমরা বলতুম নেসেলস্ চকলেট) লাল মোড়কে মোড়া চকলেটটি অতি প্রিয় ছিল, দাম মনে আছে ছ আনা ... অর্থাৎ এখনকার ৩৭ পয়সা ... যেটির এখন মূল্য ৫০ টাকা। ক্যডবেরিও ছিল, তবে মনে আছে অন্যটি প্রিয়তর ছিল। হাজরা মোড়ে মন্দিরটির ঠিক বিপরীত ফুটপাতে একটি পান-বিড়ির দোকানে গরমকালে সবুজ সিরাপ দেওয়া ঠান্ডা ঘোলের সরবত আমাদের কি ভালোই না লাগতো! তার নাম ছিলো গ্রীন ম্যাঙ্গো সরবৎ। দাম এক গ্লাস বারো আনা, তখন বড় বেশিই মনে হতো।

রেস্টুরেন্টে খাওয়া সে সব সময়ে কমই ছিল। ছোটবেলায় সাঙ্গুভেলী, বসন্ত কেবিন, বনফুল বা মিত্র কাফেতে ক্কচ্চিৎ কদাচিত টোষ্ট-ডবল-ডিমের মামলেট (ওমলেট কথাটি বাঙ্গালী মহলে চলতো না), মাংসের কাটলেট, মাছের চপ ... আমাদের দৌড় এই অবদি। আরো কিছুটা বড় হওয়ার পর, ১৯৪৫-৪৬ সালে চৌরঙ্গীতে অনাধি কেবিনের মোগলাই পরোটা এক প্লেট মাংস সহযোগে খেয়ে এক অভূতপূর্ব রসনাতৃপ্তি হয়েছিল মনে আছে। উত্তর কলকাতার পুঁটিরাম ময়রার গরম খাবার ও প্যারামাউন্টের গোলাপী শরবৎ সারা কলকাতায় খ্যাত ছিল। কলেজে পড়ার সময় কে এলেনের চিংড়ীর কাটলেট, স্বামীজীর বাড়ীর পাশে চাচার হোটেলের মুরগীর কাটলেট ও চিৎপুরের রয়েল ইন্ডিয়ানের বিরিয়ানী খেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। চীনা খাবার তখনও অত জনপ্রিয় হয়নি, টেরিটি বাজারের চাং ওয়া ও নানকিং এর সুনাম ছিল, আমরা মুখ বদলাবার জন্য মাঝে মাঝে খেয়ে আসতাম।

(দ্বিতীয় পর্ব পরের পৃষ্ঠায়)

প্রতীপ ভট্টাচার্য

স্কুল, বিনোদন

দ্বিতীয় পর্ব

আমাদের ছেলেবেলায় বাড়ীর বাইরের আমোদ-প্রমোদের সুযোগ খুব কমই থাকতো। মনে আছে সরস্বতী পুজোর দিনটিতে খুব ঘটা করে পুজো হত দাদামশায়ের বাড়ীতে। সকাল সকাল স্নান করে বাসন্তী রঙ্গের ধুতি পরনে ... সরস্বতী মহাভাগে, বিদ্যে কমললোচনে ... মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গভীর ভক্তিতে অঞ্জলী দেওয়া ও তারপর যে শিশুগুলি চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করেছে তাদের হাতেখড়ি দাদামশায়ের হাতে। দাদামশায়ের মতো বিদ্বান, বিজ্ঞ ও মান্যবর পুরুষের হাতে হাতখড়ি দেওয়াবার জন্য সব পিতা-মাতারাই ব্যগ্র হয়ে থাকতেন। অতঃপর ফলমূল প্রসাদের পর গরম গরম লুচি, আলুচচ্চড়ি ও রসগোল্লা ভক্ষণ, সে যে কি আনন্দ ছোটোদের, তা যেন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন মা সরস্বতীর নিষেধ কোন বই-এর পাতা উল্টোনো, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকের, অতএব আমাদের স্কুলের পড়ার বই ও খাতাগুলি দেবীর পাদমূলে চূড়া করে রাখা, অঙ্কের বইটি শীর্ষস্থানে শোভা পাচ্ছে। তারপর খেলা, শুধুই খেলা! ভুল করে যদি কেউ একটি গল্পের বই খুলে বসল, তো তার হেনস্থার সীমা নেই, বইএর পাতা উল্টোনো যে এ দিন নিষেধ! ভোগ হওয়ার পর সুদীর্ঘ দক্ষিণ বারান্দাটির মেঝেতে উপবেশন করে খিচুড়ি, আলু ভাজা, বড় বড় বেগুণী, পাঁচমিশালী চচ্চড়ি, টোপা কুলের অম্বল ও নতুন গুড়ের পায়েস, যেন অমৃতসমান! কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দুপুরবেলায় দাদামশায় তাঁর ডজনখানেক নাতি নাতনিদের গাড়ী ভরতি করে নিয়ে যেতেন চিড়িয়াখানায়, আমাদের সরস্বতীর পুজোর আনন্দ ষোলকলা পূর্ণ হতো। বছরে ঐ একদিনই আমাদের চিড়িয়াখানা দর্শন, আমরা তার পুরো সদ্ব্যবহারই করতাম, লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপির অন্ত ছিল না। তখন তো এইসব উচ্চতল বাড়ী ছিল না, আলীপুর নির্জন ও ফাঁকা ছিল। আমাদের ভবানীপুরের বাড়ী থেকে গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে বাঘ-সিংহের গর্জন পরিষ্কার শোনা যেত। সেই জন্তু-জানোয়ারগুলি চিড়িয়াখানায় চাক্ষুস দেখে আমরা ধন্য হতাম! একটি হিপোপটেমাসকে আমরা সভয়ে নিরীক্ষণ করতাম। একটি ছোট ভিখারিনীর কন্যা পা-ফস্কে নীচে এই জন্তুটির বিশাল মুখব্যাদনে পড়ে চর্বিত হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে নিয়ে তখন খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সংবাদপত্রে লেখালিখির পর বেষ্টনীটি জালের প্রাচীর তুলে নিরাপদ করা হয়। ১৯৪১ সালের কথা। আর বড়দের কথামতো শ্রদ্ধাভরে দেখতাম প্রায় দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন কচ্ছপটিকে, যেটি চিড়িয়াখানার নথি অনূযায়ী স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন পেয়েছিল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। স্বামীজীর এক প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্যের বইয়েও এর বিবরণ আছে। পরে জেনেছিলাম এর নামকরণ হয়েছে অদ্বৈত। এই কচ্ছপটি ২০০৬ অবদি জীবিত ছিল, বয়স ২৫০ বছরেরও অধিক হয়েছিল।

মাঝে মাঝেই বাবা-মামার সঙ্গে ছুটির দিনে আমরা গড়ের মাঠে ইংরাজ সেনাবাহিনীর ব্যান্ড বাজনা শুনতে যেতাম, জমকালো লাল পোষাক ও শিরস্ত্রাণ পরা ব্যান্ডবাহিনীর কুচকাওয়াজ সহ বাজনা দেখতে ও শুনতে ভারী ভালো লাগত, লোকের ভিড় উপচে পড়তো। এটি গড়ের বাদ্যি বলেই প্রচলিত ছিল, ফোর্ট উইলিয়ামের অধিকারে মাঠ, সেজন্য গড়ের মাঠ বলেই ময়দানটি অভিহিত হতো। আর এই মাঠে শীতকালে ইংরেজ, আমেরিকান বা রাশিয়ান সার্কাস পার্টি তাঁবু গেড়ে বসলে আমাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকতো না। জীব-জন্তুর খেলা, একটি বিশাল লৌহগোলকের ভেতর মোটরসাইকেল আরোহীর ডাকাবুকো বিচরণ, ক্লাউনদের ভাঁড়ামি, বন্য জন্তুদের সগর্জনে প্রশিক্ষকের আদেশমত খেলা ও স্বর্ণকেশী মেয়েদের সুউচ্চ দোলনায় রুদ্ধশ্বাস দোলন আমাদের ঘন্টাতিনেক নিবিষ্ট করে রাখতো।

যাদুঘর খুব কমই যাওয়া হতো, সেখানকার অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল, মমি ইত্যাদি ছোটদের মনে শিহরণ সৃষ্টি করতো। তবে আমাদের সর্বাধিক উৎসাহ ও উত্তেজনা হত যখন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো একটি বায়স্কোপ দেখার সুযোগ মিলতো। চলচ্চিত্রকে লোকে বায়স্কোপই নামেই উল্লেখ করতো। জনি ওয়েসমূলারের জন্তু-জানোয়ার-বন্ধু টারজান, শীর্ণ লরেল ও স্থুলকায় হার্ডির মজার কান্ড-কারখানা, চার্লি চ্যাপলিনের দুর্গতি দেখে আমরা সম্মোহিত হয়ে উপভোগ করতাম, বা

হেসে কুটিপাটি খেতাম তবে RKO Radio Pictures সেই প্রথম পর্বতাকৃতি গোরিলা কিংকং দেখার চমক এখনও যেন মনে আলড়ন তোলে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য দেখে কয়েক রাত্রির সুনিদ্রার ব্যাঘাৎ হয়েছিল। তখন চলচ্চিত্র সব সাদাকালো, প্রযুক্তি এখনকার মানে আদিম, কিন্তু সিনেমা হলগুলি আমাদের কাছে যেন এক মায়াপুরীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিত।

লেক তখন জনসাধারণের সহজগম্য ছিল না। ১৯২০ দশকের খনন করা এই কৃত্রিম সরোবরটি যেন শহরতলিতে অবস্থিত, বালীগঞ্জ ১৯৩০ দশক থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, দিনের বেলাতেও শেয়ালের ডাক শোনা যায়, সাপের উপদ্রবে গৃহবাসীরা সশঙ্কিত। সন্ধ্যায় ঘন অন্ধকারে লেক অঞ্চল মশার উপদ্রবে তিষ্ঠোনো যেত না। আমরা কচ্চিৎ-কদাচিৎ দুপুরবেলা লেক বেড়াতে যেতাম, বিকেল হলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হতো।

এবার স্কুলের বিষয়ে কিছু বলি। আমার কলকাতায় স্কুলে পড়ার সুযোগ খুব কমই হয়েছে, বাবার চাকুরীসূত্রে দেশের নানা শহরে বাসের কারণে। শুধু বছর দুয়েক পড়েছিলাম ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে, বাড়ী থেকে খুব কাছে। হেড মাস্টারমশাই ছিলেন হরিদাস কর, কিন্তু এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারমশাই নীতিন রায়চৌধুরীর দাপটে ছেলে-বুড়ো সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। তাঁর দুই ছেলে সমরেশ ও রণেশ এই স্কুলের ছাত্র ছিল, দুজনেই খুব ভাল গান গাইত। সমরেশদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হেমন্তর খ্যাতি তখন সবে বাড়ছে, কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে, বিশেষ করে তাঁর "আমার আর হবে না দেরি" আর "কেন পান্থ এ চঞ্চলতা" গান দুটির রেকর্ড সবে বেরিয়েছে, দম দেওয়া কলের গানে (গ্র্যামাফোন) খুব বাজানো হতো। নীতিনবাবুদের বাড়ি আমাদের বাড়ীর প্রায় লাগোয়া ছিল, প্রায়ই দেখতাম দীর্ঘাকৃতি, কৃশতনু, সুদর্শন হেমন্ত যাচ্ছেন হেঁটে হেঁটে আমাদের গলিতে সমরেশদার বাড়ী, আড্ডা মারার জন্য জন্যে।

আমাদের বাংলা ও অঙ্ক পড়াতেন প্রবাদপ্রতিম কবিশেখর কালিদাস রায় ও কেশবচন্দ্র নাগ। তাঁদেরই লেখা পাঠ্যপুস্তক আমরা পড়তাম। গম্ভীর, রাসভারী ব্যক্তিত্ব, ছেলেরা কাঁটা হয়ে পড়ায় মন দিতো। কবিশেখর যখন তাঁর রচনা ও কবিতাগুলি উদাত্তকণ্ঠে বিশ্লেষণ করে বোঝাতেন আমরা ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। স্মরণ হচ্ছে সেই সময়ে আমাদের স্কুলের ছাত্র কণক দাশগুপ্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হলেন সমগ্র অবিভক্ত বাংলায়। আমরা উদ্দিপ্ত হয়ে দেখলাম পূর্ণ সিনেমার মঞ্চে পুরষ্কার-বিতরণী সভায় বাংলার গৌরব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে অজস্র পুরস্কার গ্রহণ করছেন এই শ্যামবর্ণ, কৃশতনু কিশোরটি। ঘটনাচক্রে এর পনেরো বছর পরে আমার প্রথম কর্মস্থলে প্রথম বস্ হয়ে এলেন কণক দাশগুপ্ত, ইনি তখন বিলেত থেকে উচ্চ কারিগরি শিক্ষা লাভ করে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। কিছুদিন বাদেই এই চাকরী ছেড়ে তিনি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী হলেন তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে।

তখন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী যে কোন উন্নত বিদেশের শহরের কেন্দ্রস্থলের উপমেয় ছিল, তার ফুটপাথ দিয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত সান্ধ্যভ্রমণের রোমাঞ্চকর অনুভূতির তুলনা ছিল না। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ, চওড়া নিষ্কলুষ ফুটপাথ, বড় বড় কাঁচের জানলা সহ সমৃদ্ধ চক্ষু ঝলসানো আলোকিত ঝলমলে সব দোকান, মেট্রো সিনেমার চাঁদনীপর অসংখ্য বিজলীবাতির ঔজ্জ্বল্যে যেন এক মায়াপুরীর পরিবেশ! নিখুঁত সান্ধ্য পোষাকে সাহেবদের, আর ইভনিং গাউন পরিহিত মেমসাহেবদের শোফার-চালিত মোটরগাড়ী থেকে সসম্ভ্রমে দরজা খুলে নামতে

সাহায্য করছে মেট্রোর দীর্ঘাকৃতি শান্ত্রীটি, সিগারেট, চুরুট ও উগ্র সেন্টের গন্ধে বাতাস ভরপুর। গ্রেটা গার্বো, ভিভিয়ান লে, হামফ্রে বোগার্ট, ক্লার্ক গেবেল অভিনীত বিখ্যাত ছবিগুলি সবে মুক্তি পেয়েছে, প্রতিটি প্রদর্শনীতেই প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। তারপরেই সুবৃহৎ বিলাস-বিপণীগুলি ... হোয়াইটাওয়ে লেডল, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে হল এন্ড এ্যান্ডারসন, যা শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধণ-গোবর্ধনের বয়ানে হলধর আর ইন্দ্রসেন ও সর্বশেষে ঐ বড় রাস্তার উপরেই আর্মি-নেভি স্টোর্স, আমদানি করা সর্বাধুনিক বিলাতি ও অন্যান্য বিদেশের বস্ত্রাদি, গৃহসজ্জা ও বিলাসদ্রব্যের সম্ভারে পূর্ণ পণ্যবীথি। এই শেষোক্ত দোকানটির অনাড়ম্বর পরিবেশের জন্য আমার মা এটির অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। অন্য দোকানদুটি অতি কেতাদুরস্ত, মধ্যভাগে কাঁচের ঘরে ম্যানেজার সাহেব চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন, কোন ক্রেতা যেন বিফলমনোরথ হয়ে প্রস্থান না করেন। স্যুট বা গাউনপরা বিক্রয়কর্মচারীরা তটস্থ, ম্যানেজার সাহেবের কাছে জবাবদিহি করার ভয়ে। পাশেই সেই সময়কালে দেশ-বিদেশখ্যাত গ্র্যান্ড হোটেল, সব দেশি-বিদেশি মান্যগণ্য অতিথিদের নিবাস, বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন, রক্তবর্ণ গালিচাগুলি ও জমকালো ধড়াচূড়া পরা দ্বাররক্ষীসহ যেন এক রাজপ্রাসাদের পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। একটু অগ্রসর হলেই ফার্পো ... অনেকে এটিকে ফির্পো বলেই চিনতো ... তার বিখ্যাত ইটালিয়ান পাচকের নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নির্দিষ্ট সাতটি পদবিশিষ্ট নৈশাহার কলকাতার বিশিষ্ট মহলে আদরণীয় ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্তদের প্রিয় ছিল বেঙ্গল রেস্টুরেন্টের ফাউল কাটলেট ... সেকালে চিকেন কাটলেট ঐ নামেই অভিহিত হত ... ও নিউ ক্যাথের চীনা খাবার। জানবাজার ও চৌরঙ্গীর মোড়ের অনাদি কেবিনের মোগলাই পরোটা এক প্লেট মাংস সহযোগে বাঙালীমাত্রেরই প্রায় আবশ্যিক রসনা তৃপ্তির উপকরণ ছিল। তার বিপরীত ফুটপাতে বোর্ণ এন্ড শেফার্ডের স্টুডিও, ধনী, অভিজাত পরিবারের সৌখিন আলোকচিত্রের তীর্থস্থল। প্রায় সব অবস্থাপন্ন বাড়ীতেই এই চিত্রশালায় তোলা ফ্রেমে বাঁধানো বৃহৎ সমবেত সুসজ্জিত পরিবারবর্গের ছবি বৈঠকখানা ঘরে শোভা পেতো। কিছুদূর এগিয়ে যাদুঘর, ভেতরে পুরাকালের সব অদ্ভুত দ্রষ্টব্য, বিশেষ করে মমি দেখতে দেখতে শিহরণ জাগতো।

বড় রাস্তার একটু অন্তরালে শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, দেশি ও বিদেশি ক্রেতার ... নিউ

মার্কেট বা হগ মার্কেট। এক ছাদের তলায় সর্বশ্রেণী বিপণীর অধিষ্ঠান, প্রবাদই ছিল এখানে বাঘের দুধও বিক্রী হয়। প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকেই অপরূপ রং ও সুগন্ধে মাতানো সব পুষ্প ভান্ডার, অর্ডার দিলে দুষ্প্রাপ্য দেশ-বিদেশের পুষ্পও এঁরা আনিয়ে দিতেন। মার্কেটের ভিতর নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট করা দোকানীদের ডাক। সাহেব-মেম ক্রেতারা তো বিশেষভাবে অভীষ্ট, তাঁরা তো আর দেশিদের মতো দরদস্তুর করতে পারেন না, লাভের অংশটা বেশ লোভনীয়ই থাকে। সেজন্য দোকানীর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাঁদের সনির্বন্ধ আহবান ... কাম (Come) সার, কাম ম্যাডাম, টেক (take) তো টেক, না টেক তো না টেক, একবার তো সি (see)! সে ডাকে একবার সাড়া দিলে নাছোড়বান্দা দোকানীর হাত থেকে ক্রেতাদের আর নিস্তার নেই!

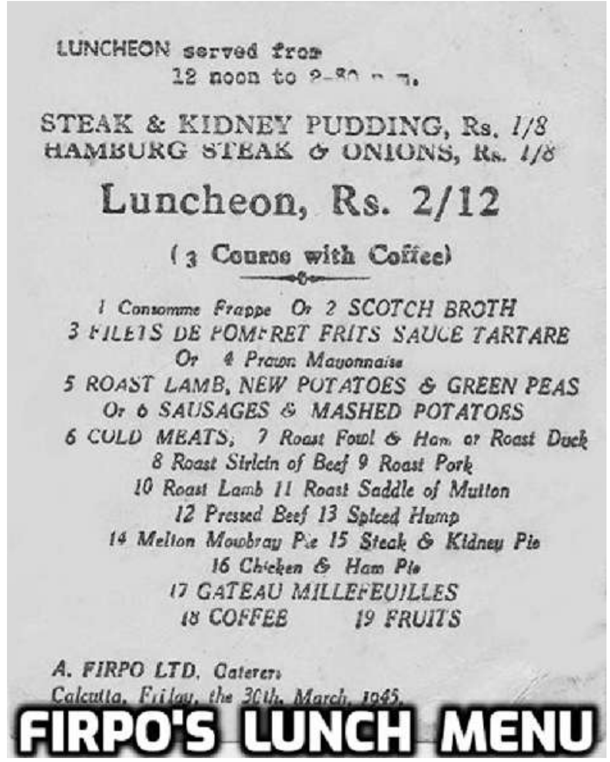
LUNCHEON served from
12 noon to 2-30 p. m.

STEAK & KIDNEY PUDDING, Rs. 1/8
HAMBURG STEAK & ONIONS, Rs. 1/8

Luncheon, Rs. 2/12

(3 Course with Coffee)

1 Consomme Frappe Or 2 SCOTCH BROTH
3 FILETS DE POMFRET FRITS SAUCE TARTARE
Or 4 Prawn Mayonnaise
5 ROAST LAMB, NEW POTATOES & GREEN PEAS
Or 6 SAUSAGES & MASHED POTATOES
6 COLD MEATS; 7 Roast Fowl & Ham or Roast Duck
8 Roast Sirloin of Beef 9 Roast Pork
10 Roast Lamb 11 Roast Saddle of Mutton
12 Pressed Beef 13 Spiced Hump
14 Melton Mowbray Pie 15 Steak & Kidney Pie
16 Chicken & Ham Pie
17 GATEAU MILLEFEUILLES
18 COFFEE 19 FRUITS

A. FIRPO LTD. Caterers
Calcutta, Friday, the 30th. March, 1945.

FIRPO'S LUNCH MENU

কত বিচিত্র পণ্যের দোকান! হরেক রকম দেশি ও বিদেশী সৌখিন বস্ত্রাদি ছাড়া বিশ্বখ্যাত বিলাতি ডওয়লটন ক্রকারি, শেফিল্ডের কাটলারি, বেলজিয়াম স্ফটিকের পাত্র ও আয়না, গৃহশোভা ও সজ্জার অতি দৃষ্টিনন্দন সব দ্রব্য, বিদেশি বই ও পত্রিকা, মেমসাহেবদের ও সৌখিন দেশীয় মহিলাদের অতিপ্রিয় সূচিশিল্প, উল ও এমব্রয়ডারির দোকানগুলি ... হ্যাবারড্যাশারী ..., হিজ মাস্টার্স ভয়েসের সারমেয় চিত্র শোভিত গ্র্যামাফোন ... যেটি ঘরোয়া ভাবে কলের গান নামেই আমরা জানতাম ... তার বিজ্ঞাপনের বয়ান ছিল, সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্র্যামাফোন! ... তৎসহ ইংরাজি ও বাংলার বিপুল ভিনাইল রেকর্ডের সম্ভার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অতি জনপ্রিয় সাধনা বসু-মধু বসুর আলিবাবা নাটকটির চার খন্ডে রেকর্ডের কথাটি। যেদিন সেটি বাজানো মহোল্লাসে তার প্রতিটি লাইন উপভোগ করতো, ছি ছি এত্তা জঞ্জাল গানটির সাথে সাথে আমাদের ছোটদের তালে তালে নৃত্যে আসর এক মহোৎসবের আকার গ্রহণ করতো। আর সবার আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হতো যখন আমাদের দাদামশাই, হাইকোর্টের মহা সম্মানিত, রাশভারি প্রাজ্ঞ উকিলটি শিশুসুলভ আনন্দে গানটির ধূয়ো ধরতেন, বা মর্জিনা-আবদুল্লার রসাল সংলাপের সাথে সাথে সেগুলি আবৃত্তি করতেন। আর আমাদের বাঁধনহারা হাসির খোরাক যোগাতো নবদ্বীপ হালদারের নক্সার রেকর্ডগুলি। আমার মামা ছিলেন সে যুগের এই শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতার অন্ধ ভক্ত, তাঁর সব রেকর্ডগুলিই মামা কিনে ফেলেছিলেন। সেই সব দিনের সহজ, সরল, নির্দোষ, অনাবিল পারিবারিক আনন্দসভার তূল্য তৃপ্তি উত্তরজীবনে আর কদাচিৎ পেয়েছি।

নিউ মার্কেটে আহার দ্রব্যের সম্ভার ছিল প্রভূত ও বিচিত্র। সামনের সারীতে মধ্য প্রাচ্য, আফগানিস্থান থেকে আমদানি মেওয়া, খেজুর, রকমারি শুকনো ফল ও পিছনের সারীগুলিতে নাহুম, ডি গামার কেক পেস্ট্রি, মাংসের প্যাটি ও স্যান্ডউইচের চাহিদা ছিল অফুরন্ত, বিদেশ থেকে আমদানি অসংখ্য প্রকার বিস্কুট, চকোলেট, চীজ ও টিনের খাবারে পিছনের সারির কয়েকটি দোকান পরিপূর্ণ। একটি আইসক্রীমের দোকানে সর্বদাই খরিদ্দারের ভীড়ের আধিক্য দৃশ্যমান। বাজারের পশ্চাৎবর্তী অংশে প্রথমেই মুদীখানার দোকানগুলি, তখন বিদেশী দ্রব্যের আমদানি অবাধ, ও সেজন্য চাল, ডাল, তেল, মশলাপাতি ছাড়াও বিদেশী পণ্যে দোকানগুলি পূর্ণ। সর্বপশ্চাৎ দোকানগুলিতে মাছ-মাংস-ডিম, ফল-সব্জির বিশাল পসরা। বিফ, পর্ক, পাঁঠার মাংস, হাঁস, মুর্গী ও আর যে কত রকমের পাখীর মাংস পাওয়া যেত তার ইয়ত্তা নেই। তিতির ও বটের পাখীর মাংসের বিশেষ কদর ছিল। বাঙ্গালীদের একটি মাংসের ওপর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সেটা হচ্ছে গ্রাম-ফেড মাটন, ভেড়ার মাংস, তাও যে সে ভেড়া নয়, ঘাস না খাইয়ে রীতিমত ছোলা ও অন্যান্য দানা খাইয়ে পালিত ভেড়া! এই মাংস

তুলতুলে নরম ও অপূর্ব স্বাদের ছিল, এর দামও ছিল সাধারণ মাংসের দ্বিগুণ! আর পূর্বে ফরমাস করলে পাওয়া যেত হরিণের মাংস, যার তুলনা মেলা ভার, সেটি তখন আইনে নিষিদ্ধ ছিল না।

চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উপসেবনের অভাব ছিল না। মেট্রো ব্যতীত প্রমোদগৃহ ছিল লাইটহাউস, নিউ এম্পায়ার, টাইগার, এলিট, গ্লোব ও মিনার্ভা, যেটির পরে নামকরণ হয় চ্যাপলিন। নিউ এম্পায়ারের মঞ্চে অনেক নাটকও অভিনীত হত। এই মঞ্চেই আমরা সম্মোহিত হয়ে দেখেছিলাম যাদুকর পি সি সরকারের (অধুনা পি সি সরকারের পিতা) চমকপ্রদ যাদুবিদ্যা, তিনি তখন সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত, তাঁর প্রদর্শনী বিদেশী দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছে। পাশ্চাত্য নাট্যকাররা প্রায়শই এখানে নাটক মঞ্চস্থ করতেন বিদেশী অধিবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য।

চৌরঙ্গী পাড়াকে বলা হত সাহেব পাড়া, বিদেশি শাসকরা শহরের এই অংশটিকে মনের মতো সাজিয়েছিল, সব ফিটফাট, ছিমছাম। সাদা জামা, হাফ প্যান্ট ও লাল পাগড়ী পরিহিত পুলিশরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারিদিকে, সাইডকারওয়ালা মোটরসাইকেলে ইঙ্গ-ভারতীয় সার্জেন্টরা টহল দিয়ে যাচ্ছে। এখন এই নয়নপীড়িত, কুৎসিত, হকারলাঞ্ছিত ফুটপাতে পদক্ষেপ করলে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস পড়ে। হায় আমাদের দুর্ভাগা কলকাতা, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান, হিতাহিতজ্ঞান কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে যার জন্য আজ তোমার এই অবক্ষয়!

(চলবে)

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) পিতার কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরেই স্কুল ও প্রাক-ইউনিভারসিটি কলেজে শিক্ষা। তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। কোর্স সমাপনে কলকাতার ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের তাদের তদানীন্তন লন্ডনের হেডঅফিস দ্বারা নিযুক্ত। আরো ৬ মাসের লন্ডনে বিশেষ ট্রেনিং এর পর দেশে প্রত্যাবর্তন ও সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

শাশ্বতী বসু

পিজা পাস্তার দেশে
রোমের কলোসিয়াম

পর্ব ৫

আমাদের আজ Colossium এ যাবার দিন । ভাবতেই একটা গা শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। গল্প শুনেছি যারা দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে, সিনেমায় দেখে অভিভূত হয়েছি। সেটাই আজ চর্ম চক্ষে দেখব সেই উত্তেজনা মনের মধ্যে কাজ করছে। তৈরি হচ্ছি যাবার জন্য।

বাস যখন রোমের পথে এগোচ্ছে দুধারে দেখছি একদা রোম সাম্রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করা স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। কালের নিষ্ঠুর আঘাতে মুখ থুবড়ে পরে আছে কোথাও বিরাট অট্টালিকার থাম, কোথাও কোন মূর্তি বা কোথাও ভাঙ্গা শ্যাওলাধরা পাথরের বাড়ি। দেখতে দেখতে চলেছি। খানিকক্ষণ পরেই দূরে, আকাশের বুকে দেখা গেল Colossium এর এক ঝলক। তারপরেই রাস্তার অদূরে তিনি সম্পূর্ণ দেখা দিলেন। কী বিশাল তার কাঠামো। কী গম্ভীর ! কালের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। পলেস্তারা ওঠা ইট বার করা। মন খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু কাজ চলছে দেখলাম। ভারা বাঁধা দেওয়ালে। কার্নিশে চলা কর্মীদের পিঁপড়ের মত ছোট ছোট লাগছে।

Colossium মেরামত চলছে

বাস থেকে নেমে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আমাদের গাইডেড ট্যুর শুরু হল। রোমান সম্রাটদের প্রাসাদ দেখার ট্যুর। দেড় ঘন্টার। এই ট্যুর নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু এই ট্যুরের মধ্যেই Colossium দেখার টিকিট রয়েছে। আলাদা করে শুধু Colossium দেখার টিকিট পাওয়া যায় নি। তাই চুপচাপ হাঁটছি দলের সঙ্গে। রোদ উঠেছে চড়চড় করে। সবার মাথায় টুপি। রাজপ্রাসাদের ধ্বংস স্তূপ দেখিয়ে গাইড আবেগ মথিত গলায় বলে চলেছে এই সেই Palatine Hill যার ওপর প্রথম রোম সম্রাট Augustus তাঁর প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন ২৭ বিসি তে। ধসে পড়া প্রাসাদের ধ্বংস স্তূপের ইঁটের পাঁজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন এই সেই Domus Augusti অথবা House of Augustus যেটা ছিল সম্রাটের প্রধান ব্যক্তিগত বাসস্থান। যে পথ দিয়ে হাঁটছি সে পথ দিয়ে সম্রাট Actium এর যুদ্ধ জয় করে বিজয় মিছিল করে ফিরেছিলেন। এই বিজয়কে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করার জন্যই তৈরি হয়েছিলো অ্যাপোলোর মন্দির। ঐ অদূরে দেখা যাচ্ছে Temple of Apollo Palatinus বা দেবতা অ্যাপোলোর মন্দির। যে জমির ওপরে মন্দিরটি রয়েছে সে জমিটি সম্রাট Augustus এর কেনার পর পরই বাজ পড়ে পুড়ে যায়। সম্রাট তখন জমিটি রোমের জনসাধারণকে দান করে দেন এবং এই স্থানে নির্মাণ করেন Temple of Apollo Palatinus। এই মন্দিরের চত্বরের ভেতর রোম সেনেটের মিটিং হত। এই চত্বরেই ছিল গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের বই এর সংগ্রহ নিয়ে ভর্তি কিছু লাইব্রেরি। তৎকালীন রোমে যে লাইব্রেরির মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের। হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেইসব সোনালী দিনের গল্প অলস মেজাজে শুনছি।

রোম সম্রাটদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ

এই সেই বাগান। এই হচ্ছে সম্রাটের প্রাইভেট লাউঞ্জ। এখানে বসে সম্রাট ঘোড়ার রেস দেখতেন। রেস হতো ঐ সামনের মাঠে যেখানে এখন চওড়া কংক্রিটের রাস্তায় হুস হুস করে গাড়ি চলছে। একটা ইটের দেওয়ালের

পেছনে প্রায় তিন-চার তলা নীচে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলেন গাইড। ঐ যে ঐ নীচে রোম সম্রাজ্ঞী অলিভিয়ার স্নানের জায়গা।

রোম সম্রাজ্ঞী অলিভিয়ার স্নানের জায়গা

ফোয়ারা ঘেরা ছিল দেশ বিদেশের দুষ্প্রাপ্য সব পাতাবাহার গাছ দিয়ে। এখনো ফোয়ারার জল পড়ার জায়গার মার্বেলের টাইলসগুলো তার সৌন্দর্য ধরে রেখেছে। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ আর গরম আমাদের সেই সোনালী অতীতের মোহতে জড়াতে পারছে না। রোদ আটকানো যাচ্ছে না টুপিতেও। ভাগ্যি ভাল সামনে একটা অলিভ গাছ ভর্তি বাগান। তার মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ। সে পথ দিয়ে যেতে যেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের প্রাণ জুড়ল। কেউ কেউ বসেও পড়লেন। আমাদের খুদেটি এতক্ষণ বাবার কাঁধে ছিল। সে ছাড়া পেয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল। গাইড মশাই আমাদের ব্রেক দিলেন। আমরা খানিক জিরিয়ে হাতে মুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে আবারও প্রাসাদের গল্প শোনার জন্য তৈরি হলাম।

এই প্রাসাদ সাজানো হয়েছিলো সাউথ আফ্রিকা থেকে হলুদ পাথর আনিয়ে। সেই হলুদ পাথর সম্রাট Augustus ভালবাসতেন। এশিয়া মাইনর থেকে আনা হয়েছিল মার্বেল পাথর। আজ আর সে সবের কোন চিহ্ন নেই। শুধু ইঁটের গাঁথুনির ধ্বংস স্তূপ ছাড়া। অবশ্য একটা মার্বেল পাথরের টাইল মাটিতে গেঁথে আছে এখনো। খর মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল সেটা। অমলিন। কী আশ্চর্য ! কাল তাকে ছুঁতে পারে নি। আমাদের ততক্ষণে নজর এসেছে সামনেই একটা বড় গেট যেখানে লোকেরা টিকিট দেখিয়ে ঢুকছে। বোঝা গেলো এই গেট দিয়েই আমাদের Colossium এ ঢুকতে হবে। গাইড মহাশয় আমাদের গ্রুপটাকে গেট পার করিয়ে দিয়ে বাই বাই বলে চলে গেলেন। অদূরেই দেখা যাচ্ছে

Colossium। খানিকটা ভগ্ন স্তূপ খানিকটা নতুন করে বানানো। বাঁ দিকে Arc of Constantine। আমরা এবার Colossium এর নীচে চলে এসেছি। আমাদের ঢোকার সময় আরও আধ ঘণ্টা পর। সুতরাং একটু বসা যাক। বিরাট এরিয়া জুড়ে Colossium এর গ্রাউণ্ড ফ্লোর। পাথরের তৈরি সিঁড়ির চওড়া চওড়া ধাপ। বসার চাইতে আরামের আর কি আছে।

Colossium এর খানিকটা ভগ্ন স্তূপ খানিকটা নতুন করে বানানো

আমরা তড়িঘড়ি তার ওপর গিয়ে বসলাম। আঃ কী শান্তি! চারদিকে আমাদের মত অসংখ্য গ্রুপের লোকজন। তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। মাটিতে টুপি ব্যাগ যে যা পেরেছে পেতে তার ওপর বসে গল্প করছে উঁচু গলায়। টুকটাক খাবার খাচ্ছে। হাতে ড্রিঙ্কস। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বেশ রিল্যাক্সিং পরিবেশ। ততক্ষণে আমাদের ট্যুর গাইড এসে গেলেন। অসম্ভব রোগা একটি তরুণী। মোটা ফ্রেমের কালো চশমার মধ্যে দিয়ে তার বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখদুটি দেখে ভরসা হল। হয়তো ভাল গল্প শোনা যাবে আজ। পাশের গ্রুপটির গাইড তখন উদ্বিগ্ন। দলের লোকজনের মধ্যে দুজন পর্যটক মিসিং। মানে এখনো এসে হাজির হন নি। সবাই ওয়েট করছে। ট্যুর শুরু করা যাচ্ছে না তাদের জন্য। মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের দলটি চলতে শুরু করেছে।

গুড আফটারনুন। তোমরা জানো Colossium আসলে একটি মুক্ত রঙ্গমঞ্চ বা খোলা নাট্যমঞ্চ। ছাদ নেই। সম্পূর্ণ ডিম্বাকৃতি আকার। ৫০ থেকে ৮০ হাজার দর্শকের আসন ব্যবস্থা ছিল সেখানে। চারদিকে দর্শকদের জন্য আসন ধাপে ধাপে উঠে গেছে। এটা এমন ভাবে তৈরি যে হলের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে মঞ্চে কী হচ্ছে সেটা দেখা যাবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেলিব্রেট করার জন্য এই Amphitheatre তৈরি হয়েছিলো। এর আরেকটা প্রচলিত নাম Flavian Amphitheatre।

কারণ Flavian বংশের তিনজন সম্রাট এটা তৈরি করিয়েছিলেন। আর একটা নাম নাকি Vometorium, কারণ একসাথে অনেক লোককে উগরে দিতে পারত এই রঙ্গ মঞ্চ। শুরু হয়েছিল ৭২ শতাব্দতে আর পুরোপুরি শেষ হতে সময় লেগেছিল ৯৬ শতাব্দী পর্যন্ত। সম্রাট নিরোর প্রাসাদের লেক আর বাগান পরিষ্কার করে সেখানে গড়ে উঠেছিল এই মুক্ত মঞ্চ।

রোমের জনসাধারণ যখন গৃহযুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত তখন তাদের মনবল ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনার জন্য বিরাট করে বিনোদন শুরু হয়েছিলো এই মঞ্চে। জনসাধারণ যুদ্ধের উন্মাদনা ও রক্ত দেখে উজ্জীবিত হত। তাই এই রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে হত্যা করা হত। জনসাধারণ উল্লাসে ফেটে পড়ত। তাঁদের adrenaline ক্ষরণ শুরু হল। সুতরাং এই হত্যালীলা প্রলম্বিত করতে গ্ল্যাডিয়েটরদের আমদানি হল। এঁরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধা যারা বিনোদনের জন্য অন্য গ্ল্যাডিয়েটর, বন্য হিংস্র প্রাণী বা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের সাথে ভয়ানক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে। অর্থাৎ গ্ল্যাডিয়েটর-রা বিনোদনের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করতো। অপরাধীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো যুদ্ধের। তারা যুদ্ধ করতো গ্ল্যাডিয়েটরদের সঙ্গে বা একে অন্যের সাথে বা একদল আর এক দলের সাথে। এই যুদ্ধ শেষে একজন বা একদল অপরাধী মারা পড়ত। তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু হতো না। কারণ এরা ছিল সব মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী।

কোন বিখ্যাত যুদ্ধের পুনরাভিনয় হত। হিংস্র পশুদের সাথে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের যুদ্ধ করতে হত। কলোসিয়াম জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রোমান সম্রাটরাও। ইতিহাস বলে Commodus বলে এক অত্যাচারী হত্যা পিপাসু রোম সম্রাট যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধই ছিল তখনকার রোমে আয়ের একটি প্রধান উৎস। সেই আয় বন্ধ হওয়াতে দেশে প্রজাদের কষ্ট শুরু হল। তখন তিনি নিজেই গ্ল্যাডিয়েটর এর ট্রেনিং নিয়ে সরাসরি মঞ্চে নেমে গ্ল্যাডিয়েটরদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতেন। শুধুমাত্র Colossium কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে প্রজাদের খাদ্যাভাব এবং দুর্দশাকে চাপা দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলানিতে ঠেকে যাওয়া জনপ্রিয়তাকেও উদ্ধার করতে। এবং তার সঙ্গে নিজের রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করতে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি এতে। গ্ল্যাডিয়েটরদের একজনই তাঁকে তার স্নানের চৌবাচ্চায় ঠেসে ধরে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে।

আমরা ভেতরের সরু সরু পথ দিয়ে কলোসিয়ামের নিচতলায় এসে পৌঁছলাম। ছোট ছোট খুপরির মত অসংখ্য ঘর দুপাশে। পলেস্তারা খসা, ইট বার করা। সেই ঘরের দরজা জানলা কিছু নেই। শুধু ঘরের কাঠামো। ঠিক যেন জেলখানার কুঠুরি। পার্থক্য হচ্ছে এই কুঠুরি বেশ সূর্যালোকিত। কারণ মাথার উপরে ছাদ নেই। খোলা আকাশ। এই কুঠুরির ছাদটি ছিল মুক্ত রঙ্গমঞ্চের মেঝে। যেখানে সব কুশীলব-রা দাঁড়াতেন। আজ মহাকাল তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। পরিবর্তে সূর্যের অকৃপণ আলো এসে পরেছে সেখানে।

দেয়ালে দেয়ালে বিশাল কুলুঙ্গি, প্রায় ঘরের মত। লোহার গেট দিয়ে আটকানো থাকতো এই কুলুঙ্গিগুলো। কারণ হিংস্র পশু থাকত এখানে।

ছোট ছোট খুপরির মত অসংখ্য ঘর দু'পাশে। জেলখানার সেল যেন।

দেওয়ালে বিশাল কুলুঙ্গিতে হিংস্র পশুদের আটকে রাখা হতো

আর জানো সেই হিংস্র পশুদের না খাইয়ে রেখে দেওয়া হত বন্দীদের সাথে যুদ্ধের আগে। যাতে অনেকদিন না খেয়ে আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে তারা এবং বন্দীদের দেখলেই উদ্দাম আক্রোশে তাঁদের আক্রমণ করতে পারে। এতে জনসাধারণ উল্লাসে উন্মত্ত হত। খেলা জমত। চোখের সামনে ভাসছে গ্ল্যাডিয়েটর সিনেমার দৃশ্য গুলো। যেখানে বন্দীরা হিংস্র সিংহর সাথে লড়ছে। কি হতভাগ্য এই বন্দীরা। গাইডের কথায় দূরে তাকালাম। ঐ দেখো লিফট। কাঠ আর লোহা দিয়ে তৈরি লিফট ওঠা নামার কাঠামো দেখতে পেলাম এক সারি। নতুন করে বানানো। ঝক্ ঝক করছে। পুরনোগুলো আর নেই। এরকম ৬০ এর বেশী লিফট ছিল তখন। মোটা দড়ি আর কপিকল দিয়ে হতভাগ্য বন্দীরা এই পশুদের এবং আবশ্যকীয় জিনিস ওপরে তুলত। নামাত। কপিকল আর দড়িও চোখে পড়লো।

কতটা শক্তি লাগত ভাবো এই লিফট ওপরে তুলতে। শুনলে তোমরা অবাক হবে এই কলোসিয়াম তৈরি হয়েছে এর গাঁথুনিতে কোন বালি সিমেন্ট এর মিশ্রণ না মিশিয়েই। ঠিক পিরামিডের মত পাথরের সব বিশাল বিশাল চাঙড় ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে। এ এক আশ্চর্য নির্মাণ কৌশল।

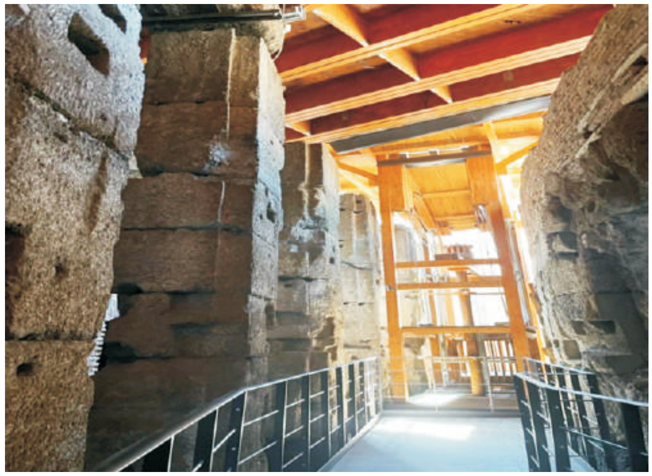

নতুন লিফট কলোসিয়াম এর ভেতরে

সুপ্রাচীন বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ডের পাশাপাশি হাল আমলের পালিশ করা কাঠ বেশ ছন্দপতন মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল খেলো সস্তা। দু'হাজার বছর আগে তৈরি পাথরের এক বিশাল নির্মাণের ভেতরে যে শিল্প ছিল সঙ্গীত ছিল, ভেঙ্গে যাওয়া খয়ে যাওয়া পুরনো ধ্বংস হয়ে যাওয়া কলোসিয়ামের ভেতরেও তার রেশ ছিল কিছুটা। কিন্তু নতুন করে তৈরি অংশগুলোতে তার ছিটেফোঁটা অবশিষ্টও নেই। অথচ কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে এই সারাই এর জন্য। ভিয়েতনামের ক্যাম্বডিয়াতে আঙ্করভাট মন্দিরেরও হুবহু এই এক অবস্থা। নতুন সারানো হয়েছে যে অংশ সেটাই তার গাম্ভীর্য, তার বিশালত্ব তার প্রাচীন আভিজাত্য হারিয়েছে। কিন্তু কিছু করার নেই। মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। ততক্ষণে আমরা আবার উপরে চলে এসেছি। মুক্ত রঙ্গমঞ্চে। মঞ্চর মেঝের জায়গাটা ফাঁকা যা আমরা আগেই শুনলাম। ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে রেলিঙ দেওয়া দর্শকদের নিরাপত্তার জন্য। ফাঁকা অংশটার চারপাশে রেলিঙ ঘিরে বসার আসন বা গ্যালারি। মুক্ত রঙ্গমঞ্চের গ্যালারির অর্ধেক অংশ দেখতে পাচ্ছি। বাকিটা নেই।

সিমেন্ট ছাড়াই পাথরের বড় বড় খণ্ড ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে কলোসিয়াম তৈরি হয়েছিলো

প্রচুর পর্যটক উপরে। অন্য গ্রুপের গাইড কথা বলে যাচ্ছেন। আমাদের গাইড বলে যাচ্ছেন – কলোসিয়ামের আসনের ব্যবস্থা ছিল অদ্ভুত। অনেক শ্রেণী ভাগ, অনেক বৈষম্য। সমাজের গন্যমান্যরা, সেনেটাররা মঞ্চের কাছাকাছি বসতেন। সবচেয়ে দূরে বসতেন গরিব লোক। আর ? আবার কে ? মেয়েরা। রাজা আসতেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যেটা সরাসরি প্রাসাদের অন্দর মহলের সাথে যুক্ত ছিল। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারটা হচ্ছে জনসাধারণ সক্রিয় অংশ নিত এই বীভৎস বিনোদনে। কোন কোন যুদ্ধে পশুর সাথে অপরাধী বা অপরাধীর সঙ্গে অপরাধীই হোক, যে জয়ী হত তাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, না মেরে ফেলা হবে সে ব্যাপারে দর্শকদের মতামত চাওয়া হত। দর্শকরা তাদের বুড়ো আঙুল "থামস আপ" কায়দায় ধরলে সে বেচারী বেঁচে যেত কয়েকদিনের জন্য। আর এর উলটোটি "থামস ডাউন" কায়দায় ধরলে তার ভবলীলা সেই রঙ্গমঞ্চেই

মুক্ত রঙ্গমঞ্চের গ্যালারির অর্ধেক অংশ

শেষ। মন খারাপ লাগছিল। দেখলাম গাইডের চোখে জল। চোখ মুছে বললেন তিনি । খ্রিশ্চান ধর্মীয় অনেক লোক এই রক্তাক্ত বীভৎস খেলার বিপক্ষে ছিলেন। পোপ এর বিরোধী ছিলেন। তা ছাড়া টাকা পয়সার দিকটাও ছিল। কলোসিয়াম বিনোদনের জন্য প্রচুর খরচ হত। রোমান সাম্রাজ্যের সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছিল। যুদ্ধজয় করে লুঠপাট করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। সুতরাং ভাঁড়ারেও টান পড়েছিল। খাবার মিলছিল না। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছিল। সম্রাট Constantin ১ শেষ পর্যন্ত Colossium মুক্ত মঞ্চের এর দরজা বন্ধ করলেন। শেষ পর্বে গাইডের সাথেও আমরা ফটো তুললাম। নিজের পেশার সাথে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন। একে মনে থাকবে।

তথ্যসূত্রঃ পর্যটক গাইড, অন্তর্জাল

(চলবে)

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney. I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ৯

(১৫)

মাঝে মাঝে ওর নিয়তির কথা মনে ক'রলে শর্মিলার নিজেকে বড় অসহায়, বড় বঞ্চিত, বড় শূন্য মনে হয়। সুশান্তকে ও বাস্তবিকই ভালবেসেছিল। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল সুশান্ত পুরোপুরি ওর "টাইপ"। সুশান্তর সঙ্গে ওর জীবন পরিপূর্ণতা পাবে। বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তার জোরেই সুশান্তর প্রত্যাখ্যানকে আমল না দিয়ে ওর সঙ্গেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল শর্মিলা।

অথচ, ওদের বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই হত্যার দায়ে জড়িয়ে উধাও হয়ে গেল সুশান্ত। শত চেষ্টা ক'রেও সুশান্তর বাবা বা মায়ের কাছ থেকে ওঁদের ছেলের হদিশ পেল না শর্মিলা। কোনদিন কি সুশান্ত আবার ফিরে আসবে ওর কাছে! দিনের মধ্যে কতবার যে এই প্রশ্ন জাগে ওর মনে!

কিন্তু রাতগুলো কিছুতেই কাটতে চায় না। খালি অ্যাপার্টমেন্টটা ওকে গিলতে আসে। শূন্য বিছানায় শুয়ে থাকে রিক্ত মন এবং বঞ্চিত দেহ নিয়ে। সুশান্ত হারিয়ে যাওয়ার পর আর কাউকেই কামনা করেনি শর্মিলা। ভালও বাসতে পারেনি আর কাউকে।

তারপর হঠাৎ সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদিন। তখন সঞ্জয় বিবাহিত। ওর নতুন ক'রে মনে পড়ল এককালে সঞ্জয় গভীরভাবে ভালবেসে ছিল, ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার সঞ্জয় তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করল। বলল, সে নাকি তার স্ত্রীকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। শর্মিলার জন্য তার অন্তরে আর কোন স্থান নেই। সঞ্জয়ের প্রত্যাখ্যান কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। বারবার মনে হয়, যে সঞ্জয় একদিন ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিবাহের প্রস্তাব রেখেছিল, পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল প্রত্যাখাত হয়ে তার এখন এমন পরিবর্তন কি সত্যিই সম্ভব! শর্মিলা কি তাহলে সঞ্জয়ের কাছে পরাজয় মেনে নেবে? শ্রীতমার কাছে হেরে যাবে? নাহ্, কিছুতেই না। অথচ সঞ্জয়ের প্রত্যাখ্যান, শ্রীতমার কাছে পরাজয় হাসিমুখে, অনায়াসে মেনে নিত শর্মিলা, সুশান্ত ওর কাছে ফিরে এলে। তা যখন হবার নয়, সঞ্জয়কে নিজের ক'রে দাবী করবেই শর্মিলা। শ্রীতমার কাছ থেকে সঞ্জয়কে কেড়ে নিতে এখন বদ্ধপরিকর সে। কিছুতেই ওদের একসঙ্গে ঘর করতে দেবে না। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা যে সুস্থ বা স্বাভাবিক নয় এবং শর্মিলার মত একজন সম্ভ্রান্ত, স্বাধীনচেতা মহিলার পক্ষে একান্ত বেমানান, তা বোঝে শর্মিলা। কিন্তু মনের সংবেগ যে যুক্তি চালিত নয়! সব বুঝেসুঝেও অন্তরে ফেনিয়ে ওঠা আবেগ সংযত করতে পারে না। অথচ কি ভাবে সঞ্জয়কে আবার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে ভেবে পায় না! কাজটা খুব কঠিন নয়, যেহেতু শ্রীতমা আর সঞ্জয় আপাততঃ এক শহরে বাস করে না। কিন্তু ওদিকে সঞ্জয় আর শর্মিলাও যে এক শহরের বাসিন্দা নয়! তাহলে?

এইসব ভাবনা-চিন্তা যখন শর্মিলাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলছে তখনি, একদিন ওর কর্মস্থলে একটা ওয়ার্কশপে অপ্রত্যাশিত ভাবে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখানে এসেছে এক মাসের ট্রেনিংয়ে। কিড্‌নী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায়, ডায়েলিসিস মেশিন ডিজাইন সংস্করণ ক'রতে চায় ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ন মেডিকেল কলেজ। তাই চাক্‌রী সূত্রেই সঞ্জয়ের ইন্ডিয়ন ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল সায়েন্সে আসা। কিড্‌নী বিশেষজ্ঞ শর্মিলা অ্যাকিউট কিড্‌নী ফেলিয়র আর ক্রনিক কিড্‌নী ফেলিয়র রোগীদের চিকিৎসা করে। তাই ওয়ার্কশপে সেও আমন্ত্রিত।

লঞ্চ ব্রেকে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হল। শর্মিলা জানতে পারল যে সঞ্জয় এক মাসের ট্রেনিংয়ে এসেছে এবং গ্রেটর কৈলাশে একটা হোটেলে থাকবে। সন্ধ্যেবেলা সঞ্জয় যখন হোটেলে ফেরার জন্য, গেটে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা ক'রছে, শর্মিলার গাড়ি ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

– "উঠে এসো", চালকের সীট থেকেই হাত বাড়িয়ে সামনের দরজাটা খুলে দিল সে।

– কিন্তু আমি তো ট্যাক্সির অপেক্ষায় – "সঞ্জয় ইতস্ততঃ ক'রল"।

– "বেশ তো! ধরে নাও এটাই তোমার ট্যাক্সি আর আমিই ট্যাক্সি ড্রাইভার," মিষ্টি হেসে শর্মিলা বলল।

সঞ্জয়কে দোনোমনা ক'রতে দেখে সে আবার বলল, "উঠে এসো চট্‌পট্। এখানে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার নিয়ম নেই"।

তাই তো! এতক্ষণ সঞ্জয় ব্যাপারটা ভেবে দেখেনি। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে শর্মিলার পাশে বসল। একটু এগিয়ে শর্মিলার নিপুণ গাড়ি চালানো লক্ষ্য ক'রে ও বলল, "বাঃ! তুমি দেখছি এই জনারণ্যের মধ্যেও বেশ কনফিডেন্টলি গাড়ি চালাচ্ছ"। সঞ্জয়ের মনে পড়ে গেল, মেলবোর্নে শর্মিলার গাড়িতে চেপে সে কত ঘুরে বেড়িয়েছে এক সময়ে!

শর্মিলা আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে বলল, "কেন! তুমি গাড়ি চালাও না"?

– "নাঃ! দরকার পড়ে না। কাশীতে আমাদের বাড়ি থেকে বি.এইচ.ইউ. হেঁটে যেতে লাগত মাত্র পাঁচ মিনিট। ভেলোরেও, আমার বাড়ি থেকে খ্রিশ্চান মেডিকেল কলেজে অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যায়"। বি.এইচ.ইউ. থেকে দূরত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে সঞ্জয় বলল, "আমাদের বাড়ি" অথচ ভেলোর প্রসঙ্গে বলল, "আমার বাড়ি"। তফাৎটা লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হ'ল শর্মিলা।

– "দেশের বাতাবরণে অন্ততঃ আমি কার্বন ছড়াচ্ছি না ব'লে, ভারত সরকারের কাছ থেকে আমার একটা পুরস্কার পাওনা আছে।" হেসে বলল সঞ্জয়।

– সত্যিই তো! দিল্লীর বায়ু দূষণ নাকি পৃথিবীর আর সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ঈস্, কোনো মানে হয়!

আর একটু এগিয়ে শর্মিলা জিজ্ঞেস ক'রল, "তুমি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হোটেলেই ক'রে নেবে। সে নিয়ে আমার কোন টেনশন নেই"।

– "কিন্তু আমার যে টেনশন হচ্ছে, সঞ্জয়। এই এক মাস ধরে তোমাকে আমি হোটেলে খেতে দেব, ভেবেছ? কখনোই নয়। নেভার"।

সঞ্জয়কে নীরব দেখে সে আবার বলল, "তোমার মনে আছে সঞ্জয়, আমরা দু'জনে আমাদের ফ্ল্যাটে কত রান্না-বান্না করতাম"?

– "খুব মনে আছে। তোমার কাছেই তো আমার রান্না শেখার হাতেখড়ি। ভাগ্যিস শিখিয়েছিলে রান্নাটা। আমি এখন বেশ এক্সপার্ট রাঁধুনে, জানো"?

"ভালবাসার ব্যাপারেও তো তোমার হাতেখড়ি আমিই দিয়েছিলাম, সঞ্জয়," মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শর্মিলা বলল।

– "দোজ ওয়ের দ্য ফন ডেজ। কত আনন্দে কেটেছিল সেই দিনগুলো", দীর্ঘশ্বাস ফেলে শর্মিলা বলল।

সঞ্জয় চুপ ক'রে রইল।

– যাক্ গে, আমার ফ্ল্যাটে তোমাকে নিয়ে যাই চলো। সেখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে, তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দেব'খন।

– "না, শর্মি, না", মনে মনে শিউরে উঠে সঞ্জয় বলল, "প্লীজ, আমাকে আমার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি এখন ক্লান্ত। হোটেলে ফিরে আমি শুয়ে পড়ব"।

– "তোমার কি মনে হয়, না খাইয়ে তোমাকে আমি শুতে যেতে দেব? নিশ্চয়ই না", শর্মিলা হেসে বলল, "আচ্ছা সঞ্জয়, তুমি কি আমাকে এখনও ভয় পাও"?

– কেন? ভয় পাব কেন?

– তুমি হঠাৎ অমন শিউরে উঠলে, তাই বললাম। ভয় পেও না, আমি তোমার কোন ক্ষতি ক'রব না।

– কি যে বলো!

– শোন, আমি থাকি গ্রীন পার্কে। গ্রেটার কৈলাশে তোমার হোটেল থেকে আমার বাড়ি খুব দূরে না। কাজেই, তুমি এখন আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যাবে। ডিনারের পর আমি তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসব। অগত্যা!

শর্মিলার ফ্ল্যাট ছোট, কিন্তু ছিমছাম। সাজানো গোছানো। অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম-সহ দুটো শোবার ঘর। ছোট রান্নাঘর এবং সংলগ্ন ডাইনিং স্পেস। এছাড়া, মাঝারি আকারের একটা বৈঠকখানা।

অতি দ্রুত ফ্রেশ হয়ে, গোলাপি রংয়ের একটা লং ড্রেস পরে বেরিয়ে এসেই রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াল শর্মিলা। কৌতূহলী হয়ে খানিক পরে, সঞ্জয়ও রান্নাঘরে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়াল। খুব মন দিয়ে একটা কিছু রান্না করছে শর্মিলা। অবাধ্য চুলগুলো কপালে, চোখে, মুখের ওপর এসে পড়ছে বারবার আর শর্মিলা বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। বিন্দু, বিন্দু ঘাম চিক্‌চিক্ ক'রছে ওর কপালে।

মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল সঞ্জয়। তারপর বলল, "কি রান্না করছ অত মন দিয়ে? কাজ থেকে ফিরে এসে রান্নায় লেগে পড়ারই বা কি দরকার ছিল"?

শর্মিলা রান্নায় এমন মগ্ন ছিল যে খেয়ালই করে নি যে সঞ্জয় ওর পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। হেসে বলল, "এমন কিছু রান্না করছি না। খেয়ে বুঝবে কি রাঁধছি"।

সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাইনিং স্পেসে রাখা একটা ক্যাবিনেট খুলে দুটো বাহারে গ্লাস বার ক'রল। তারপর ফ্রিজ থেকে বার ক'রে এনে টেবিলের ওপর রাখল একটা রেড বার্গান্ডির বোতল। রান্নাঘরের আলমারি থেকে কিছু কাজু এনে ঢালল একটা কাঁচের প্লেটে। তারপর সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বলল, "এবার বোতলটা খোল"।

সঞ্জয় বোতল খুলে গ্লাস দুটোতে পানীয় ঢেলে একটা ওর হাতে দিল আর একটা নিজে নিল। তারপর ওরা দুজনেই মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের গ্লাস ঠেকিয়ে একসঙ্গে বলল, "চিয়র্স"!

একটু পরে খুব সুস্বাদু তেহরী, কষা মাংস, স্যালাড আর রায়তা ডিনরে পরিবেশন ক'রল শর্মিলা।

দুজনেই তখন ক্ষুধার্ত। পরম তৃপ্তি সহকারে খেতে লাগল সঞ্জয়। খাবার মাঝে বলল, "এত সব রান্না ক'রে ফেললে তুমি, এরই মধ্যে? অ্যামেজিং!"

– কিছুই অ্যামেজিং নয়। খানিকটা মাংস আর রায়তা দু'দিন আগেই ক'রে ফ্রিজে তুলে রেখেছিলাম। এখন তো শুধু তেহরী আর রায়তাটা বানালাম। তাতে আর কতটুকু সময় লাগে বলো! তুমি সঙ্গে না এলে হয়ত' তেহরীটা আর বানাতাম না। দোকান থেকে দুটো নানরুটি কিনে নিয়ে আসতাম। ব্যস?

– "আচ্ছা, তুমি তো মস্ত বড়লোকের মেয়ে। আবার মস্ত ধনী ঘরের বৌও! তোমাকে কেন বাড়ি এসে তেতে-পুড়ে রান্না ক'রে খেতে হয়? তোমার বাড়িতে রান্নার লোক, হাউস কীপর নেই কেন, বলো ত'!"

ওর প্রশ্ন শুনে একচোট হেসে নিয়ে শর্মিলা বলল, "কি ক'রি বলো। অস্ট্রেলিয়াতে অতগুলো বছর কাটিয়ে এবং সেখানে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ পর্যন্ত ক'রে এই বদ অভ্যাসটা আমার হয়েছে। কাজের লোক, চাকর-বাকরের আইডিয়াটা আমার অসহ্য লাগে। নিজের কাজ নিজে ক'রে নিতে, নিজের খাবার নিজে রেঁধে নিতে আমি খুব পছন্দ ক'রি। কারো ভরসায় থাকতে হয় না।" একেবারে ঠিক কথা। সঞ্জয় মনে মনে ভাবল।

খাওয়া-দাওয়ার পর, রেড বার্গান্ডির বোতলটা শেষ ক'রে উঠে পড়ল ওরা দুজন।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বার ক'রে নিয়ে শর্মিলা চলল সঞ্জয়কে ওর হোটেলে পৌঁছে দিতে। কিছুটা পথ এগিয়ে শর্মিলা হঠাৎ বলল, "জানো সঞ্জয়, অনেক দিন পর আজ যেন আমার বাড়ির মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন টের পেলাম। এয়র কন্ডিশনর থেকে ঠান্ডা হাওয়ার তরঙ্গগুলো চারিদিকে আছড়ে পড়ে গাইতে লাগল, হ্রদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে!"

– কেন, হঠাৎ এমনটা মনে হ'ল তোমার?

– কারণ আমি ছাড়া আর তো কাউকে দেখতে পায় না আমার বাড়ির আসবাবপত্র, আমার ইন্‌ডোর প্ল্যান্টগুলো, আমার বিছানা। এয়র কন্ডিশনরের ঠান্ডা হাওয়া আমাকে ছাড়া আর কাউকে ছুঁতে পারে না। তাই আজ তোমার উপস্থিতি ওদের কাছে নতুনত্ব। বেঁচে থাকার স্পন্দন জাগিয়েছে ওদের মধ্যে আর আমার মনেও সেই স্পন্দন ভেসে এসে আলোড়ন তুলেছে। আসলে আনন্দ জিনিসটা খুব সংক্রামক।

এসব কি আবোল তাবোল বকছে, শর্মি, সঞ্জয় মনে মনে ভাবল। অত অল্প সময়ের মধ্যে রেড বার্গান্ডির বোতলটা দুজনে মিলে শেষ ক'রে দেওয়া মোটেই ঠিক কাজ হয় নি! সঞ্জয়ের নিজের মাথাটাও একটু ঝিমঝিম ক'রছে। সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে বেড়াচ্ছে। এসবও যে রেড বার্গান্ডির মহিমা, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই!

হোটেল এসে পড়তে গাড়ি থামিয়ে সহসা সঞ্জয়ের মাথাটা নিজের বুকের ওপর টেনে এনে ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল শর্মিলা। ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, "থ্যাঙ্কিউ ফর ইওর কম্পানি, সঞ্জয়। গুড নাইট"।

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি নেমে এসে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, "গুড নাইট"।

গাড়িটা চলে যাবার পর স্থাণু হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, ধীরে ধীরে হোটেলে দিকে এগোল সে। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর থম মেরে বসে রইল কতক্ষণ। সারা শরীর জুড়ে তড়িৎপ্রবাহ তখনো চলছে ওর। একটু পরে দেহের এক কোণ থেকে ভয় সাকার হয়ে উঠে এসে টুঁটি চেপে ধরল সঞ্জয়ের। হিস হিস ক'রে বলল, "বিশ্বাসঘাতকতা করছিস তুই? বৌটাকে কি জবাব দিবি এরপর? ও না তোর পথ চেয়ে বসে আছে"?

– আমার পথ চেয়ে বসে আছে না ছাই। শ্রী আমাকে ত্যাগ করেছে। চিরকালের মত আমাকে নির্বাসন দিয়েছে ওর জীবন থেকে।

– না, কখনোই না। আসলে ও তোকে পরীক্ষা ক'রছে। সেই পরীক্ষায় তুই ফেল ক'রে বসে থাকবি? ছিঃ, ছিঃ!

নিজের ঘরে এসে সঞ্জয় অনেক ক্ষণ ধরে স্নান ক'রল। তারপর রাত্রির পোশাকটা পরে নিয়ে বিছানায় এসে ফোনটা তুলে নিল।

– "হ্যালো, কে"? ওপার থেকে সাড়া এল।

– রজত, আমি সঞ্জয় বলছি।

– কি আশ্চর্য! এত রাতে তুই কোথা থেকে ফোন করছিস?

– দিল্লী থেকে। আমার হোটেল থেকে।

– হোয়াট্‌স্ অপ্"

– "রজত, তুই একবার চলে আয়, ভাই", কাতরকণ্ঠে বলল সঞ্জয়, "আমাকে বাঁচা। শর্মির হাত থেকে বাঁচা আমাকে। ও আমাকে গ্রাস ক'রতে চায়, আবার"।

– ঠিক আছে। কয়েক দিনের মধ্যে আমি আসছি। তোর ঠিকানা বল। মোটে চাপ নিস না তুই। বী স্ট্রং। রুখে দাঁড়া ওর বিরুদ্ধে। তোর জন্য। শ্রীতমার জন্য।

বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ ছটফট ক'রে কাটাল শর্মিলা।

সঞ্জয়ের সঙ্গে খেলায় আবার সে মেতে উঠতে চাইছে। সঞ্জয়ের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে মনে হ'ল না, ওকে নিজের কাছে টেনে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হবে শর্মিলাকে। সঞ্জয়কে জড়িয়ে আদর ক'রতে গিয়ে নির্ভুলভাবে শর্মিলা টের পেয়েছে যে ওরই মত সঞ্জয়ের বুভুক্ষু দেহ উন্মুখ হয়ে আছে নারীসঙ্গর জন্য। যে সঞ্জয়কে শর্মিলা আগে চিনত, সে ছিল কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এক অনাঘ্রাত ছেলে, নীতিবোধের শৃংখলে বাঁধা। কিন্তু আজ যে সঞ্জয়ের ছোঁয়া ও পেল সে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। নারীদেহের আস্বাদন সে পেয়েছে। আর নারীদেহের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখন সে হয়ে উঠেছে কামনায় উন্মুখ। সঞ্জয়কে নিজের বিছানায় টেনে আনতে বিলম্ব হবে না শর্মিলার! অর্থাৎ অবিলম্বে সঞ্জয় আর তার স্ত্রী শ্রীতমাকে পরাস্ত ক'রবে সে।

কিন্তু তাও কেন খুশী হ'তে পারছে না সে শর্মিলা। বরং অন্তরে জেগে উঠছে শঙ্কা, সংশয়, দ্বিধা। সত্যি সত্যিই কি তার জীবনের উদ্দেশ্য সঞ্জয়কে একান্তভাবে নিজের ক'রে পাওয়া? তার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করা? এখন সন্দেহ হচ্ছে শর্মিলার। কারণ এখন, এই মুহূর্তে ওর কাছে যে এসে দাঁড়িয়েছে, সে সঞ্জয় নয়। সে সুশান্ত।

কেন এখনো ফিরে এলে না তুমি সুশান্ত? মনে মনে গুম্‌রে উঠল শর্মিলা।

মাস ছয়েক আগেই সেই হত্যাকান্ডের মামলার নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছে দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টে। আসল আততায়ী ধরা পড়েছে। সুশান্ত আর তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়েছে প্রতিপক্ষ। আবার তাও সুশান্ত এখনো কেন গা ঢাকা দিয়ে আছে!

* * * * *

প্রতিদিন হাসপাতালে, ওদের কর্মস্থলে দেখা হয় সঞ্জয় আর শর্মিলার। দুপুরে ক্যাফেটেরিয়াতে একসঙ্গে বসে ওরা লাঞ্চ খায়।

সঞ্জয় বায়োমেডিকাল ইঞ্জিনিয়র। এখন ওদের টীম, ইনস্টিটিউটে শর্মিলার মত কয়েকজন কিড্‌নী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একজোট হয়ে একটা নতুন ডায়েলিসিস যন্ত্র ডিজাইন করার সম্ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

সন্ধ্যে হলে, শর্মিলার গাড়িতে বসে প্রায়ই ওরা কোন রেস্টোরেন্টে একসঙ্গে ডিনার সারে, তারপর সঞ্জয়কে ওর হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় শর্মিলা। শর্মিলার আচরণ এখন সংযত এবং সঞ্জয়ও এখন সতর্ক। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে শর্মিলার আকর্ষণের কাছে সে হেরে যাবে না কিছুতেই।

এরমধ্যে একটা উইকেন্ডের ঠিক আগে, শুক্রবার রাতে জিমখানা ক্লাবে গিয়ে রাজসিক খাওয়া-দাওয়া ক'রল সঞ্জয় আর শর্মিলা। সঙ্গে খুব দামী শার্ডনে ওয়াইন। সেই সন্ধ্যায় ডিনারটা ক্রমে বেশ জমে উঠল।

– "তোমার একা-একা কেমন লাগে, সঞ্জয়"? শর্মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

– ঠিক জানি না। কখনো কখনো খুব ডিপ্রেস্‌ড্ বোধ ক'রি অবশ্য।

– শ্রীতমা ফিরবে। ওর অপেক্ষাতেই তো বসে আছি।

– সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেলই বা কেন, ইন্ দ্য ফর্স্ট প্লেস?

– বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ওকে বলেছিলাম, তাই।

– "আমার জন্য তোমাদের সেপারেশন"? শর্মিলার দুই আয়ত চোখ জুড়ে বিস্ময়। বলল, "সে কি? কেন"?

– সে অনেক কথা। এখন বলতে ইচ্ছে ক'রছে না।

– "ঠিক আছে, বোলো না তাহলে," ব'লে ফিকফিক ক'রে হাসতে লাগল শর্মিলা, "তা আমার জন্যই যখন বিচ্ছেদ তোমাদের, তখন লেট ইট বী। চলো, তুমি আর আমি এক সঙ্গে লিভ-টুগেদার করি। আমাদের দুজনেরই শরীর এবং মনের সব অবসাদ, সমস্ত শূন্যতা উবে যাবে"।

এরই মধ্যে শর্মিলার বেশ নেশা হয়েছে। কেন যে এমন দ্রুত চুমুক দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিঃশেষ করে দেয় গেলাস! মনে মনে ভাবল সঞ্জয়।

– কি হ'ল? কথা নেই কেন মুখে? থাকবে আমার সঙ্গে, প্লীজ?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সঞ্জয়। তারপর চেয়ারের গায়ে ঝোলানো জ্যাকেটটা পরতে পরতে বলল, "এবার উঠে পড়ো, শর্মি। তোমার এখন বাড়ি ফেরা দরকার।"

– চলো। তুমি, আমি দুজনেই আমার বাড়ি যাই। বাড়ি গিয়ে, জড়াজড়ি ক'রে বিছানায় শুয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি দু'জনে।

সঞ্জয় বুঝল শর্মিলা এখন কিছুতেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার অবস্থায় নেই। ওর গাড়িটা ক্লাবের ম্যানেজরের জিম্মায় রেখে দিয়ে, একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে শর্মিলাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল সঞ্জয়। ওকে ওর বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে ও হোটেলে ফিরে যাবে ঠিক ক'রে ড্রাইভারকে অপেক্ষা ক'রতে বলল। তারপর, শর্মিলাকে দুই হাতে শক্ত ক'রে ধরে লিফ্‌টে উঠে দশ তলায় ওর ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অবশেষে। ফ্ল্যাটে ঢুকে ওকে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে, বিছানায় বসিয়ে দিয়ে সঞ্জয় বলল, "এবার তুমি শুয়ে পড়ো। আমি চলি। গুড নাইট"। ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'তেই, সহসা উন্মাত্তের মত শর্মিলা ছুটে এসে সঞ্জয়কে ধরে বিছানার ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর সে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। দুই হাতে সঞ্জয়কে কঠিন আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে, অধীর আগ্রহে ওর মুখে চুম্বন করল শর্মিলা। একবার, দু'বার এবং বারংবার।

শর্মিলার আলিঙ্গনের সেই গভীর উষ্মা এবং মুহূর্মুহূ চুম্বনের আবেগ কয়েক মিনিটের জন্য অবশ ক'রে দিল সঞ্জয়কে। শুধুমাত্র কয়েক মিনিট। জোর ক'রে ওকে ঠেলে দিয়ে উঠে ছিট্‌কে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। শর্মিলাও তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে এসে আবার সঞ্জয়কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে বলল, "ভালবাসি। আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। খুব, খুব, খুব"।

"স্টপ্ ইট্"! ব'লে সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে ওর গালে সপাটে একটা চড় মেরে সঞ্জয় বলল, "আর কত নির্লজ্জ হবে তুমি, শর্মি! নিজেকে আর কত নীচে নামাবে তুমি"?

"সঞ্জয়", বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল শর্মিলা।

সঞ্জয় শান্তকণ্ঠে বলল, "যথেষ্ট মাতলামি হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো, দয়া ক'রে। আমি চললাম"।

বেরিয়ে আসার আগে এক টুক্‌রো কাগজে শর্মিলার গাড়ির হদিশ লিখে খাবার টেবিলের ওপর রেখে, দরজা লক্ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

পরদিন থেকে কর্মস্থলেও শর্মিলাকে এড়িয়ে চলল সঞ্জয়। হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়াতে না গিয়ে বাইরের রেস্টোরেন্টে লাঞ্চ খাওয়া আরম্ভ করল। শর্মিলার নজর বাঁচিয়ে, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরতে লাগল। এইভাবেই কয়েকটা দিন শর্মিলার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে কাটিয়ে দিল সে।

(১৬)

আচ্ছা, এটা কি সম্ভব! আশৈশব যে মূল্যবোধ, সংস্কার এবং চিন্তাধারা নিয়ে একজন বড় হয়েছে, কোন এক সময়ে তা সহসা আমূল বদলে যাওয়া! সম্ভব কি!

শ্রীতমা ইদানীং প্রায়ই ভাবে।

মাত্র কিছুদিন আগেই যে নীতিবোধ এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার জীবন কাটছিল, আজ সেই সব নীতিবোধ, সেই সব বিশ্বাসকে ওর মনে হয় ঠুন্‌কো।

ন্যায়, নীতি অথবা নৈতিক বোধ – যে নামেই অভিহিত করা হোক, শ্রীতমার মানবীসত্ত্বার সেই অভিভাবক বাস্তবিকই কি নির্মূল মুছে দিতে পারে সঞ্জয়ের প্রতি তার ভালবাসাকে?

বিজয়া আর পবিত্রকে হারিয়ে শ্রীতমা এখন বড় একা। তার ওপর সে এখন অনুভব করছে যে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন মেয়েদের অন্য মহিলারা সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে। বিচ্ছেদের কারণ জানতে তাদের যে ঘোর কৌতূহল তাই থেকে জন্ম নেয় নানা রকম গুজবে। এবং অনিবার্যভাবে অপরাধের সম্পূর্ণ দায়িত্বটি এসে পড়ে ডিভোর্সি মেয়ের ওপর। অন্যদিকে, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মেয়েদের প্রতি সব বয়সের পুরুষদের আবার অন্য রকম আগ্রহ। স্বামী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া মেয়েদের এঁরা মনোরঞ্জনের সামগ্রী ব'লে মনে করে এবং তাদের সঙ্গে অল্পস্থায়ী একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে ওঠে। অবশ্যই নিজের স্ত্রীর অগোচরে এবং গোপনে।

শ্রীতমার কাছে ওর পি.এইচ.ডি. থিসিসের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে। ইউনিভর্সিটি যাবার কথা মনে করলে আজকাল বিরক্তি আসে মনে।

রাতে বিছানায় শুয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে কাটানো কিছু মাসের বিবাহিত জীবনের ছবিগুলো ভেসে বেড়ায় ওর চোখের সামনে। কি আনন্দেই না ছিল সেই দিনগুলো।

তারপর একদিন শর্মিলা বসু বলে একটা নাম ওদের মাঝে ঢুকে পড়ে ফাটল ধরিয়ে দিল ওদের গভীর সম্পর্কে। বিপর্যয় নেমে এলো শ্রীতমার জীবনে।

এখন প্রায়ই শ্রীতমা ভাবে, বাস্তবিকই কি সঞ্জয় ঘোর অপরাধ করেছিল কোন এক সময়ে শর্মিলাকে ভালবেসে? তখন তো শ্রীতমা আসেনি ওর জীবনে! আবার শ্রীতমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর, স্ত্রীকে ভালবাসার মধ্যে কোন ফাঁক তো রাখেনি সঞ্জয়! শ্রীতমাকে ঘিরেই তো স্বপ্নের জাল বুনছিল সে! কোন রকম দ্বিচারিতা, মিথ্যাচারণ করে নি! সত্যিই তো, ওর জীবনের অতগুলো বছর পিছিয়ে গিয়ে, শর্মিলাকে জীবন থেকে মুছে ফেলে, তার অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা কি ভাবে সম্ভব হ'ত সঞ্জয়ের পক্ষে? অথচ তার সেই অক্ষমতার খেসারত ওকে দিতে হচ্ছে শ্রীতমার কাছে। সত্যিই কি সঞ্জয়কে অপরাধী ধরে নিয়ে, বাকী জীবনটা দূরে সরে থাকবে শ্রীতমা?

এদিকে মেয়ে আর জামায়ের সম্পর্ক নিয়ে মামা, মামীমা এবং প্রতিবেশীদের অনবরত প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে উঠছেন গৌরী। তিনিও অবসাদে ভুগছেন ইদানীং।

রাজীব মাঝে-মধ্যে আসে শ্রীতমার সঙ্গে দেখা করতে। শালিনী আসে না ওর সঙ্গে। কাশী এলে সে তার শ্বাশুড়ি আর দেওরদের সঙ্গে সময় কাটাতে চায়। রাজীবের একা আসা-যাওয়াটা গৌরী পছন্দ করেন না। ওঁর আশঙ্কা প্রতিবেশীরা কোনদিন হয়ত' রাজীব আর শ্রীতমাকে নিয়ে গুজব তুলবে। মেয়েকে আভাস-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন তাঁর মনোভাব কিন্তু শ্রীতমা পাত্তা দেয়নি।

একদিন রাজীব এসে বলল, "শ্রীতমা – শালিনী আর আমি বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর দর্শন করতে যাচ্ছি। আপনিও আসবেন না কি আমাদের সঙ্গে"?

– "বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির"? শ্রীতমা কৌতূহলি চোখে তাকাল রাজীবের দিকে।

– হ্যাঁ। মির্জাপুর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে গঙ্গার কিনারায় সে এক পীঠস্থান। খুব নাকি জাগ্রত দেবী। যা চাইবেন দেবীর কাছে, তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে দেবেন।

– রাজীব, আপনি কি মানেন এই সব?

- আমার সাধ্য কি যে এসব মানব না"? রাজীব খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, "আমার শালিনী যে খুব মানে এই সব। ওর খুব ইচ্ছে, মাকে একবার দর্শন করতে যাওয়ার। ওর ইচ্ছেই যে আজকাল আমার কাছে আমার বসের হুকুমের চেয়েও ঢের বেশী ইম্পর্টেন্ট। আপনি আমাদের সাথে যাবেন কি না বলুন। ওন্‌লি আ ডে ট্রিপ। সকালে যাব আর সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব"।

– নাঃ!

– আর একবার ভেবে দেখুন। মা বিন্ধ্যবাসিনী আপনার সব ইচ্ছাপূরণ করবেন। এই বিষয়ে শালিনী শত-প্রতিশত নিশ্চিত।

– শালিনীকে বলবেন আমার প্রার্থনা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর কাছে যেন পৌঁছে দেয়।

– আপনার প্রার্থনাটা কি তা বলবেন তো!

– বলতে হবে কেন? মা বিন্ধ্যবাসিনী তো অন্তর্যামী। তিনি আমার মনের সব খবর রাখেন।

রাজীব নীরবে ওর দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে বলল, বেশ, আপনার জন্য যা সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে মঙ্গলকারী, আমরা আপনার জন্য মায়ের কানে সেই প্রার্থনাই পৌঁছে দেব। আপনার আর আপনার স্বামীর জীবনপথ যেন আবার এক হয়ে যায়। আপনার মুখে যেন আবার আগের মত হাসি ফুটে ওঠে।

* * * * *

কয়েকদিন পর সন্ধ্যেবেলা। সবে ইউনিভর্সিটি থেকে বাড়ি ফিরে এক কাপ কফি নিয়ে বসেছে শ্রীতমা। গৌরী টি.ভি.টা খুলে দিলেন আর তখুনি সংবাদটা ভেসে এলো টি.ভি.র পর্দায়। সঙ্গে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা রাজীব সান্যালের ছবি। রাজীবের চোখের চাহনি উদ্‌ভ্রান্ত। ভূতে-পাওয়া মানুষের মত।

খবরে শোনা গেল এক রোমহর্ষক, অবিশ্বাস্য কাহিনী। ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট রাজীব সান্যাল তাঁর নব-পরিনীতা স্ত্রী শালিনীকে নিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে গিয়েছিলেন আজ সকালে। শালিনী সান্যাল ওই এলাকার এক পান্ডার সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে পুজো দেবার জন্য প্রবেশ করেন। বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর, মন্দিরের বাইরে অপেক্ষমান তাঁর স্বামী মন্দিরের মধ্যে স্ত্রীকে খুঁজতে ঢোকেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পান না। বেরিয়ে এসে ওই এলাকায় তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা সত্ত্বেও স্ত্রীর হদিশ না পেয়ে, ডি.এস.পি. রাজীব সান্যাল ক্ষিপ্ত হয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার ক'রে মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা পান্ডাদের ওপর গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিস বাহিনী খবর পেয়ে এসে তাঁকে নিরস্ত্র করে। আটজন পান্ডা তাঁর হাতে প্রাণ হারিয়েছে ততক্ষণে। শালিনী সান্যালকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বজ্রাহত হয়ে ব'সে রইল শ্রীতমা। রাত আরও ঘনিয়ে এলো ধীরে ধীরে। গৌরী মেয়েকে খেতে ডাকলেন। কাঠের পুতুলের মত উঠে খাবার টেবিলের কাছে গিয়ে বসল সে।

– "পান্ডারা শালিনীকে কোথায় নিয়ে গেল, কে জানে! বেঁচে আছে কি না, তাই বা কে বলতে পারে" গৌরী মৃদুস্বরে বললেন।

চিন্তার ঝড়ে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত শ্রীতমার সারা রাত দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটল। বিজয়া, পবিত্র, রাজীব, শালিনী – কতবার যে আনাগোনা করল চিন্তার সেই নিরন্তর তুফানের মধ্যে। তারপর ভোর যখন গুটিগুটি এগিয়ে আসছে, শ্রীতমার ঘরের জানালায় ফুটন্ত সূর্য যখন উঁকি দিচ্ছে, ওর মাথার মধ্যে ঝড় থেমে গেল। বিস্মিত হয়ে শ্রীতমা দেখল এক অপরিচিত ওর শিয়রে এসে বসেছে। সযত্নে চন্দন-চর্চিত প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছে ওর কপালে। সেই কোমল, শীতল স্পর্শ দুই চোখে ঘুম এনে দিল শ্রীতমার। "সঞ্জয়, তুমি এসেছ! আহ্ কি শান্তি", তন্দ্রাচ্ছন্ন সুরে বিড়বিড় ক'রে বলল শ্রীতমা।

* * * * *

গত রাতে মেয়ের শোচনীয় মানসিক অবস্থা দেখে গৌরী কাজে যান নি। খবরের কাগজে সবিস্তারে রাজীবের ঘটনাটা বেরিয়েছে। সোফায় বসে তাই পড়ছিলেন তিনি। গৌরী যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই! শালিনী এক গা গয়না পরে মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিল। ওর সাথে যে পান্ডা গিয়েছিল সে লোভ সামলাতে পারে নি।

গতকাল রাতে বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরের কাছাকাছি গঙ্গায় ভাসমান নিরাভরনা শালিনীর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে পুলিস। ওই অঞ্চলের সব কটা মন্দির নাকি এখন পান্ডাহীন। প্রাণের ভয়ে তারা গা ঢাকা দিয়েছে। ডোর বেল বেজে উঠল অকস্মাৎ। ব্যস্ত হয়ে গৌরী উঠে গিয়ে দরজা খুললেন।

– মাসীমা, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সঞ্জয়ের বন্ধু রজত। ওর বিয়ের আগে একবার এবাড়ি এসেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। মনে পড়ছে আপনার"? আগন্তুক বলল।

– অবশ্যই মনে পড়ছে, বাবা। এসো ভেতরে এসো।

রজতকে ঘরে বসিয়ে, ওর মুখোমুখি বসে গৌরী জিজ্ঞেস করলেন, "সঞ্জয়ের সঙ্গে তোমার কি সম্প্রতি দেখা হয়েছে? কেমন আছে ও"?

– ভাল আছে। ও এখন এক মাসের জন্য দিল্লি গিয়েছে। একটা ট্রেনিংয়ে।

একটু উশখুস করে রজত আবার বলল, "মাসীমা, শ্রীতমার সঙ্গে একটু দেখা ক'রতে পারি? জরুরি প্রয়োজন"।

– "নিশ্চয়ই," বলে গৌরী শ্রীতমার ঘরের দিকে চলে গেলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীতমা চলে এলো বসার ঘরে। রজতের পাশে বসে শুষ্ক মুখে বলল, "কি খবর, রজতদা? আপনি হঠাৎ"?

– তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

– সে কি! কোথায়?

– দিল্লি। এখুনি তৈরি হয়ে নাও। আমাদের প্লেন ছাড়বে আর চার ঘন্টা পর।

– কিন্তু কেন? দিল্লি যাব কেন?

– তোমার স্বামীটি এখন দিল্লিতে। এবং তোমাকে ওঁর বিশেষ প্রয়োজন।

– "মানে? কি প্রয়োজন"? শ্রীতমা বিচলিত হয়ে বলল।

– সঞ্জয় ভাল নেই, বৌমা। তোমার এখন অভিমান ক'রে থাকার সময় না।

– কি হয়েছে ওর?

– কি হয়েছে! এখনো হয়ত' তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু হ'তে চলেছে। বৌমা, সঞ্জয় আবার বুঝি শর্মিলার খপ্পরে পড়ে!

শ্রীতমা হাঁ ক'রে রজতের দিকে চেয়ে রইল। রজত আবার বলল, "এখন তুমি নিজেই ঠিক করো সঞ্জয়কে তোমার স্বামী বলে দাবী করবে, না, শর্মিলার হাতে ছেড়ে দেবে!"

মিনিট খানেক ভুরু কুঁচকে ভাবল শ্রীতমা। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, "চলুন, তাহলে দিল্লি যাওয়া যাক"।

শ্রীতমা ঘরে চলে গেল কয়েকটা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ততক্ষণে চা আর জলখাবার নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন গৌরী।

– "বাঃ! লুচি আর আলুর দম! এরই মধ্যে? সত্যি, মাসীমা, আপনি না – অ্যামেজিং"। পুলকিত হ'য়ে রজত বলল।

গৌরী একটু হাসলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুমি হঠাৎ এখানে এলে যে?"

– শ্রীতমাকে নিয়ে আজ আমি দিল্লী রওনা হব, মাসীমা। সঞ্জয় এখন সেখানেই আছে।

– এবার হয়ত' ওদের মিল হয়ে যাবে, মাসীমা। সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। অন্ততঃ সেই চেষ্টাই ক'রব আমি।

– "বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় যেন তাই হয়," দু'হাত মাথায় ঠেকালেন গৌরী। বললেন, "তোমাকে কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেব, রজত"।

– "উঁহু। ধন্যবাদ দিতে হবে না, মাসীমা", রজত বলল, "আপনি শুধু আমাকে আপনার সোনার হাতে রান্না করা পোলাউ, মাংস, দই মাছ, ইলিশ ঝাল, পটলের দোরমা – এসব ভরপেট খাওয়াবেন"।

– "তাই হবে, কথা দিলাম"। গৌরী বললেন।

(১৭)

একদিন সকালে, বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারল না সঞ্জয়। প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হ'য়ে শুয়ে রইল সে। একটা দিন কেটে যাবার পর খবর পেয়ে হোটেলের ম্যানেজর সঞ্জয়কে দেখতে এলেন ওর ঘরে। তখনও সে অচৈতন্য।

সঞ্জয়ের কর্মস্থলের সঙ্গে যোগাযোগ করায়, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর শর্মিলার কানে খবরটা দিলেন। সঞ্জয়ের সঙ্গে শর্মিলার দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুত্বের কথা তিনি জানতেন।

শর্মিলা যখন হোটেলে জ্বরে বেহুঁশ সঞ্জয়ের ঘরে প্রবেশ ক'রল, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ম্যানেজার সাহেব ছুটে এসে জানালেন যে ওকে একজন ডাক্তার ইতিমধ্যে এসে দেখে এন্টিবায়োটিক্স দিয়ে গিয়েছেন। এবং তাঁরই পরামর্শমত জ্বর কমাবার ওষুধও দেওয়া হয়েছে সঞ্জয়কে।

– "এঁকে কি হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করব আমরা"? ভয়ে ভয়ে ম্যানেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন শর্মিলাকে।

– "এন্টিবায়োটিক্স যখন চালু হয়েছে, তখন অন্ততঃ আর একটা দিন দেখা যাক। কাল অবধি ওকে অবজারভেশনে রাখব আমি। – তারপর"।

একজন ডাক্তার এবং রোগীর নেক্সট অফ কিন্ হবার সুবাদে ওই ঘরেই থাকা এবং শোবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন ম্যানেজর সাহেব।

হাসপাতালে থেকে ছুটি নিয়ে পরের কয়েকটা দিন সঞ্জয়ের দেখাশোনা করল শর্মিলা। তৃতীয় দিন সকালে খানিক ভাল ব'লে মনে হ'ল ওকে। চোখ মেলে চারিদিক তাকিয়ে শর্মিলাকে দেখতে পেল ও।

– "তুমি কখন এলে, শর্মি"? কোমল স্বরে বলল সঞ্জয়, "কি হয়েছে আমার"?

– "আমি এখানে তোমার দেখভাল ক'রতে এসেছি। গত দু'দিন তোমার ঘরেই রাত্রিবাসও করছি"।

মুচ্‌কি হেসে শর্মিলা বলল, "তোমার খুব বিশ্রী ধরনের ফ্লু হয়েছে। তবে এন্টিবায়োটিক্স পড়ে গিয়েছে। সেরে উঠতে দেরী হবে না"।

– এখানে আমার পাশে এসে বসো, শর্মি।

একটু আশ্চর্য হ'ল শর্মিলা। ওর পাশে গিয়ে বসতেই, শর্মিলার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের মাথার ওপর রেখে সঞ্জয় বলল, "আমি বুঝতে পারছি তুমি খুব একা। খুব দুঃখী। তোমাকে কথা দিচ্ছি শর্মি, ভাল হয়ে উঠে আমি সুশান্তকে খুঁজে বার ক'রব। ক'রবই। দেখি, কেমন ক'রে লুকিয়ে থেকে তোমাকে কাঁদায় ও"!

শর্মিলা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সঞ্জয়ের দিকে। কি ক'রে ও জানতে পারল শর্মিলার অন্তরে লুকিয়ে রাখা সত্যিটা! সঞ্জয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এত কান্ডর পরেও! ওর মত উদার, অবারিত হ্রদয় থাকলে বোধ ক'রি বন্ধুত্বের হাত এভাবে সহজেই বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

মনের ভাব প্রকাশ না ক'রে, মুচ্‌কি হেসে শর্মিলা বলল, "বাব্বাঃ! শখ কম নয়, বাবুর! উনি যাবেন আমার বরকে খুঁজে আনতে! আমার বর একজন বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের একমাত্র ছেলে। ওর বাবাই যখন ওর হদিশ পেল না এখনও, তখন ওর হদিশ পাবে তুমি"!

"অবশ্য", শর্মিলা আবার বলে উঠল, "অবশ্য আমার দৃঢ় ধারণা যে সুশান্তর বাবা প্রণব রায় নিজেই ওঁর ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছেন কোথাও, কিন্তু আমাকে বলছেন না"।

– "তাহলে আমাদের ইন্‌ভেস্টিগেশন প্রণব রায়ের বাড়ি থেকেই আরম্ভ হবে" সঞ্জয় বলল, "চিন্তা কোরো না তুমি"।

খানিক নীরবতার পর সঞ্জয় আবার বলল, "আর শর্মি, সেই রাতে তোমার সঙ্গে ওরকম দুর্ব্যবহার করেছিলাম ব'লে আমি মরমে মরে আছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো"।

শর্মিলা মিষ্টি হেসে বলল, "তাই বুঝি"?

– সে রাতে তোমার মাত্‌লামো থামাবার আর কোন উপায় ভেবে পাই নি আমি!

সঞ্জয়ের হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে ধরে রইল শর্মিলা।

– তুমি এক সময়ে বন্ধু হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলে। অনেক সাহায্য ক'রেছিলে, শর্মি। তার জন্য আমি তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আর এখনও, আমাকে অসুস্থ দেখে, তোমার সব কাজ ফেলে রেখে আমার শিয়রে এসে বসেছ, সে কি কোনদিন ভুলে যাবার? বলো?

শর্মিলা নীরবে ওর দিকে চেয়ে রইল।

সঞ্জয় আবার বলল, "শর্মি, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকবে। আর শ্রীতমা – শ্রীতমা চিরজীবন আমার পাশটিতে থাকবে আমার অর্ধাঙ্গিনী হয়ে। কোন প্ররোচনায়, কোন প্রলোভনে এর অন্যথা হবে না।

– "এত বিশ্বাস তোমার নিজের ওপর সঞ্জয়", সজল চোখে শর্মিলা বলল।

– আমার বিশ্বাস মন্ত্রশক্তির ওপর, শর্মি। বিয়ের সময়ে পুরুত মশায় যে মন্ত্র ব'লে আমাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রশক্তির জোরেই আজ বলছি, আমি যত দিন বেঁচে থাকব, শ্রীতমা ছাড়া আর কেউ আমার জীবনে থাকবে না।

মাঝ নদীতে ডুবন্ত মানবীর মত সঞ্জয়ের হাতটা নিজের দুই হাতে শক্তভাবে চেপে ধরল শর্মিলা। কয়েক ফোঁটা চোখের জল টপ্‌টপ্ ক'রে সঞ্জয়ের হাতের ওপর ঝরে পড়ল।

– "মে উই কম ইন"? দরজাতে যেন টোকা দিল।

দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল শ্রীতমা আর তার পেছনে রজত। বিছানায় শায়িত সঞ্জয় এবং সজল চোখে দাঁড়িয়ে থাকা শর্মিলাকে মিনিট কয়েক দেখল শ্রীতমা। তারপর তীব্রকণ্ঠে বলল, "কি ব্যপার? কি চলছে এখানে"?

ওরা তিনজনেই সঞ্জয়ের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

– "সঞ্জয়, কি হয়েছে? কেমন আছিস তুই"? উদ্বিগ্ন হয়ে রজত প্রশ্ন ক'রল।

সঞ্জয় উত্তর দেবার আগেই, শর্মিলা বলল, "তিনদিন ধরে ওর খুব জ্বর। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিল। আজ সকালে চোখ মেলেছে। চিকিৎসা চলছে"।

– "আপনি"? রজত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

– "ওহ্, সরি। আমি শর্মিলা বসু, সঞ্জয়ের দীর্ঘদিনের বন্ধু। নেক্সট অফ কিন্ তো সঞ্জয়ের এখানে কেউ ছিল না, তাই আমিই –"

– "বেশ। সঞ্জয়ের নেক্সট অফ কিন্ এখন এসে পড়েছে, আপনি এই ঘর থেকে বিদেয় হোন", তীব্রস্বরে বলল শ্রীতমা।

সঞ্জয়ের গালে কে যেন সজোরে চপেটাঘাত ক'রল। তড়িৎস্পর্শে বিছানার ওপর উঠে বসে ও বলল, "ছিঃ, শ্রী। এতখানি রূঢ় হওয়া কি একজন শিক্ষিত মানুষকে সাজে? তুমি জানো না, শর্মি এই ক'দিন নিজের সব কাজ ফেলে আমার শিয়রে এসে বসে আছে। আমার দেখভাল ক'রছে। আর তুমি ওকে এভাবে অপমান ক'রছ"?

শ্রীতমা লেশমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বলল, "আমি চাই, শর্মিলা বসু এই মুহূর্তে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান এবং ভবিষ্যতে আমার স্বামী সঞ্জয়ের ধারে-কাছে যেন তিনি না ঘেঁসেন"।

সঞ্জয় আর রজত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

– "আসি সঞ্জয়, টেক কেয়র। তাড়াতাড়ি সেরে উঠো", বলে শর্মিলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক তিন জনই বাক্যহারা হ'য়ে বসে রইল। যেন হঠাৎ উঠে থেমে যাওয়া একটা ঝড়ে বিধ্বস্ত ওরা নিজেদের সংযত ক'রতে প্রয়াসী।

– "এখন কেমন বোধ হচ্ছে, সঞ্জয়", বরফ ভাঙ্গল রজত।

– "আজকে অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে"! ব'লে শ্রীতমার দিকে চেয়ে সঞ্জয় বলল, "তুমি হঠাৎ? কি মনে ক'রে"?

– "ওকে আমিই ধরে এনেছি, সঞ্জয়", রজত বলল, "তোর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবে এটাই ছিল আমার কর্তব্য"।

আবার কিছুকাল-ব্যাপী নীরবতা।

রজত আবার বলল, "আমি কফি খেতে যাচ্ছি। তোদের জন্যও নিয়ে আসব'খন"।

রজত চলে গেলে, সঞ্জয় বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে কেন, শ্রী? এসে বোসো আমার পাশে। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও, দেখি"।

শ্রীতমা এসে সঞ্জয়ের বিছানায় বসে ওর মাথায় বিলি কাটতে লাগল।

– "তারপর? কি খবর তোমার? কি ঠিক ক'রলে অবশেষে"? সঞ্জয় বলল।

– ঠিক ক'রলাম যে আজ থেকে আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকব। তোমাকে আর ছেড়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

– কেন? সম্ভব নয়, কেন? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের, সমাজের চাপে কি?

– "না", শ্রীতমা মৃদুকণ্ঠে বলল, "কারো কোন চাপের তোয়াক্কা আমি ক'রি না। আমি চলি আমার অন্তরের চাপে। আমার বিবেকের চাপে।

– কি রকম?

– অগ্নিকে সাক্ষী রেখে, মন্ত্রপাঠ ক'রে আমাদের যে বিয়ে হয়েছিল, তাকে অস্বীকার করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? আর তোমাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমার জীবনে তুমিই একমাত্র পুরুষ। প্রথম এবং শেষ।

– বুঝলাম। কিন্তু আমার জীবনে যে তুমিই প্রথম নারী নও, সেটা মেন নিয়েছ তো তুমি?

– হ্যাঁ।

– "আর কে জানে", মুচ্‌কি হেসে সঞ্জয় বলল, "আবার কোন সময়ে, শেষ নারীটিও তোমার জায়গায় এসে বসতেই পারে। অনাগত ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে! এই মুহূর্তে তোমাকে অবশ্য নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি, কিন্তু তাই ব'লে সারা জীবনই যে তুমি আমার জীবনে অনন্যা হ'য়ে থাকবে, সেই গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি না"।

ডান হাত দিয়ে ওর মুখটা শক্ত ক'রে চেপে সঞ্জয়ের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে শ্রীতমা বলল, "তোমার জীবনে প্রথম নারীকে তো একটু আগেই বিদেয় ক'রে দিলাম। আর আজ আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আমি বেঁচে থাকতে অন্য কোন নারী তোমার কাছ ঘেঁসতে পারবে না। দেখে নিও।

রজত কফি আর পেস্ট্রি নিয়ে ফিরে এলো খানিক পরে। বলল, "আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমি রওনা দিই, কি বলিস"?

– "রজত, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। জরুরি কথা", সঞ্জয় বলল।

– আবার কি জরুরি কথা? তোর "জরুরি" কে তো হাজির ক'রে দিলাম তোর কাছে। এখন আবার কি?

– সে জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমরা দু'জন আর তোকে ছোট ক'রব না। এটা অন্য একটা জরুরি ব্যাপার।

দুই বন্ধুকে কথা বলার সুযোগ দিতে শ্রীতমা উঠে যাচ্ছিল, সঞ্জয় বাধা দিয়ে বলল, "যেও না, শ্রী। এই ব্যাপারটা তুমিও শোন। আমার আশা যে অন্ততঃ একজন সাইকোলজিস্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার ক'রে তুমিও শর্মিলার দুঃখটা বুঝবে"।

অস্ট্রেলিয়া থেকে দিল্লী ফিরে আসার পর শর্মিলার জীবনে যা যা ঘটে গিয়েছে, সব ওদের বলল সঞ্জয়। শেষে বলল, "শর্মিলা তার স্বামী সুশান্তকে বাস্তবিকই ভালবাসে এবং তার ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনছে এখনো। ওর বিশ্বাস সুশান্তর মনেও এতদিনে পরিবর্তন ঘটেছে। সুশান্ত এখন ওকে ভালবাসে। অথচ নিজের দাম্ভিক, অভিমানী ব্যক্তিত্বের আড়ালে শর্মিলা লুকিয়ে রেখেছে মনের সব ব্যথা, সব দুর্বলতা। অবশ্য প্রকাশ ক'রেই বা কি লাভ! চারিদিকের লোকজনের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া!

– "হুঁ", সব শুনে, সংক্ষেপে বলল রজত।

– রজত, যে ক'রো হোক, সুশান্তকে আমাদের খুঁজে বার ক'রতেই হবে। শর্মিলা তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আগে।

– "আমার তো মনে হচ্ছে, রহস্যের চাবিকাঠি আছে সুশান্তর বাবা প্রণব রায়ের হাতে", রজত বলল।

– আমারও তাই মনে হয়। তাই ওঁকে বোঝাতে হবে ওঁর পুত্রবধূ সুশান্তর হিতৈষী। সে সুশান্তর অপেক্ষায় দিন গুনছে। হয়ত' মন গলবে তাঁর। ছেলের হদিশ দেবেন তিনি।

– "অথবা, ছেলে যদি বিদেশবাসী হয়েই থাকে, বৌমাটিকেও সেখানে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'র দেবেন", রজত যোগ দিল, "তোর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা হিসেবে, শর্মিলার জীবনটাকেও রাইট ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমাকেই ক'রতে হবে মনে হচ্ছে"।

দিল্লীতে ট্রেনিং শেষ ক'রে ওরা ভেলোরে চলে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। সেখান থেকে ছুটি নিয়ে কাশী চলে এলো সঞ্জয় আর শ্রীতমা। ভেলোর জায়গাটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল শ্রীতমার। ভাবছিল যদি সেখানকার ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সেলিং সেন্টারে একটা সুযোগ পায়, তাহলে সেও ভেলোরে চলে আসবে।

– "কিন্তু কেন, তুমি বেনারস হিন্দু ইউনিভর্সিটি ছেড়ে দিয়ে ভেলোরে আসার কথা ভাবছ", সঞ্জয় প্রশ্ন তুলেছিল।

– "কারণ আছে একাধিক", শ্রীতমার উত্তর, "প্রথমতঃ আমি তোমাকে চোখে হারাই। দ্বিতীয়তঃ আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি সারা জীবন তোমাকে আগলে রাখব। তোমার কাছাকাছি না থাকলে সেটা কিছুতেই সম্ভব না। আর –"

– আর কি?

– "আর, কাশীতে আমার কোন আকর্ষণ রইল না। জয়া নেই, পবিত্র নেই। আর রাজীব এখন থেকেও নেই", বলতে বলতে দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল শ্রীতমার।

– কিন্তু তোমার মা?

– চেষ্টা ক'রব ভবিষ্যতে মা'কে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে। তা নইলে আমরাই মাঝে মাঝে এসে মা'র সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে যাব। আর মামা-মামীমা তো আছেনই।

* * * * *

গৌরী বললেন, তিনি খবরের কাগজে পড়েছেন যে রাজীব সান্যাল নাকি এখন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন মেডিকাল কলেজের সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে ভর্তি। মানসিক সন্তুলন হারিয়ে ফেলে সে এখন উদ্‌ভ্রান্ত।

– "আমার সঙ্গে তুমিও চলো না, সঞ্জয়। রাজীব তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চেয়েছিল", শ্রীতমা বলেছিল।

– কেন?

– ও খুব চাইত, তোমার কাছে আমি ফিরে যাই। জানো, সম্পর্কের প্রসঙ্গে পরিসর আর ছায়ার কথা প্রায়ই বলত ইদানীং।

– "পরিসর! ছায়া"!, ভুরু কুঁচ্‌কে বলেছিল সঞ্জয়।

– রাজীবের থিয়োরি ছিল যে সমাজে প্রতিটি মানুষ আবদ্ধ থাকে সম্পর্কের পরিসরে। আবার তার সেই পরিসরের মধ্যে নানা সম্পর্কের জন্য নির্দিষ্ট ছায়া থাকে। সীমানা থাকে। বিবিধ সম্পর্কের জন্য ধার্য একেকটি ছায়া। যে কোন একটি ছায়াকে লঙ্ঘন ক'রে অন্য কোন সম্পর্কের ছায়ার মধ্যে ঢুকে পড়লেই বিপদ। রাজীবের সঙ্গে দেখা হ'লে আমাকে ও মনে করিয়ে দিত পরিসরের ভেতরের ছায়াগুলোর কথা। বলত, আপনার নিজের জন্য নির্ধারিত সম্পর্কের বিশেষ ছায়াকে লঙ্ঘন ক'রে অন্য কারো পরিসর-ছায়ার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ ক'রতে যাবেন না। এবং অপর কাউকেও আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে শুধু তাঁর নির্দিষ্ট ছায়াটুকুর মধ্যেই থাকতে দেবেন।

– "ইন্টারেস্টিং"! সঞ্জয় বলেছিল, "তোমার রাজীব পুলিস অফিসার হয়েও এমন দার্শনিক মনোভাব পোষণ করেন"!

অতঃপর একদিন সকালে সঞ্জয় আর শ্রীতমা রাজীবকে দেখতে গেল বি.এইচ.ইউ.র সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে। রাজীবকে আপাততঃ সেখানেই রাখা হয়েছে।

ডেপুটি সুপারিন্‌টেনডেন্ট পুলিস রাজীব সান্যালের ঘর খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না ওদের। রাজীবকে ঘরে নিয়ে যাবার সময়ে নার্স বলল, রাজীব আপাততঃ কাউকেই ঠিক চিন্‌তে পারছে না। ওর মা, ওর ভাইরা – কেউই এখনও ওর স্মৃতিতে স্পষ্ট নয়। শুধু আপন মনেই কথা বলে। আর সেই কথাবার্ত্তা ওদের কাছে অর্থহীন প্রলাপের মত মনে হয়। তবে বই এখনো ও খুব পড়ে এবং বই পড়েই অনেক সময় কাটিয়ে দেয় রাজীব।

– "রাজীবের প্রোগনোসিস্ কি? সম্পূর্ণ সুস্থ হবে কি"? শ্রীতমা প্রশ্ন ক'রল নার্সকে।

– মানুষের মন এতটাই জটিল যে সহজে বলা যাবে না। কিন্তু ওঁর তরুণ বয়স, তীক্ষ্ণ মেধা এবং পুলিসী ট্রেনিং-এর কথা মাথায় রেখে মনোবিশ্লেষকেরা আশা ক'রছেন যে ইনিশিয়াল শক্‌টা কেটে গেলে উনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন। পুলিশ বিভাগও ওঁকে খুব সাহায্য ক'রছে।

রাজীবের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নার্স চলে গেল। সঞ্জয় আর শ্রীতমা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখল, একটা চেয়ারে বসে, রাজীব চুপ ক'রে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

– "রাজীব", কোমল কণ্ঠে ডাকল শ্রীতমা, "রাজীব, আমি এসেছি আর দেখুন কাকে সঙ্গে এনেছি"।

জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাজীব ওদের দেখল। বেশ কিছুক্ষণ নিরিক্ষণ ক'রে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "হ্যালো, আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু নামটা ঠিক মনে ক'রতে পারছি না। আর আপনার সঙ্গে উনি কে? ঠিক চিনতে পারছি না তো ওঁকে"।

– উনি আমার হাসব্যান্ড, সঞ্জয় ব্যানার্জি। আর আমি শ্রীতমা। ডিবেটে অল্‌ওয়েজ আপনার অপনেন্ট। আর আপনার ম্যাগাজিন "গুঞ্জন"এ একজন স্টেডি কন্ট্রিবিউটর, যে আপনাকে কোনদিন নিরাশ করে নি। মনে পড়ছে?

ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটেই মিলিয়ে গেল রাজীবের ঠোঁটে। উদ্বেগ ছায়া ফেলল দুই চোখে। বলল, "আচ্ছা, কোন খবর কি পাওয়া গেল?

– কি খবর?

– আমার শালিনীর? পান্ডারা যে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রে রেখেছে। ওর গায়ে অনেক সোনা-হীরে-চূনি-পান্নার গয়না ছিল তো! লোভ সামলাতে পারে নি পান্ডা ব্যাটারা। আমার পুলিশ বাহিনী কি হদিশ পেল কিছু?

শ্রীতমা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

– পায় নি তো? ঠিক জানতাম। এক্কেবারে নিষ্কর্মা, ফাল্‌তু লোক সব। আবার ওরাও অনেকে করপ্ট। ঘুষ খায়। লোভের খাতিরে বিবেককে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। পান্ডাগুলো ওদের কত ঘুষ দিয়েছে কে জানে!

সহসা রাজীবের চোখেমুখে কৌতূকময় ধূর্ত হাসি। চেয়ার থেকে উঠে শ্রীতমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, "শ্রীতমাকে একদিন বলেছিলাম যে পুলিশ অফিসার হ'য়ে আমি কিছু দুর্জনদের সাফ ক'রে ভারতবর্ষকে অন্ততঃ একটু পাপমুক্ত ক'রব। আমার কথা রেখেছি, জানেন। শ্রীতমার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, বিন্ধ্যবাসিনী মায়ের অঞ্চলে সব ক'টা লোভী, শয়তান, দুরাত্মা পান্ডাকে আমি গুলি ক'রে উড়িয়ে দিয়েছি। আর কারো ক্ষতি করার জন্য ওখানে একটাও পান্ডা বেঁচে নেই"।

ওর হাত ধরে ওকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল শ্রীতমা। গভীর স্নেহে রাজীবের উস্কোখুস্কো চুলগুলোকে কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "কোন চিন্তা করবেন না আপনি। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখবেন"। বলতে বলতে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তার।

– "মিথ্যে বলছেন। কি ক'রে আর সব ঠিক হয়ে যাবে, শুনি? শালিনী তো আর কোনদিন আমার কাছে ফিরে আসবে না"! অসহায় ভাবে শ্রীতমার দিকে তাকাল রাজীব। তারপর হঠাৎ ওর হাত দুটো নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, "আপনার সঙ্গে যদি কোনদিন শ্রীতমার দেখা হয়, ওকে বলবেন, পরিসরের মধ্যে ছায়াগুলোর হদিশ যেন সে ঠিক ঠিক রাখে। সমাজে সবার সাথে বেঁচে থাকার, সমাজে নিজের অস্তিত্বকে সসম্মানে ধরে রাখার, সেটাই প্রথম শর্ত"। একটু থেমে আবার বলল, "আর – আমি নিজেও, শ্রীতমার সঙ্গে সম্পর্কের পরিসরে আমার নির্দিষ্ট ছায়া লঙ্ঘন করার চেষ্টা কখনো করিনি আমি। বলবেন তাকে"।

– "আচ্ছা, বলব"। ব'লে ওর বুকের ওপর ধরে রাখা নিজের হাত দুটো টেনে নিল শ্রীতমা।

রাজীবকে দেখে, একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরছিল সঞ্জয় আর শ্রীতমা। কারো মুখে কথা ছিল না সারাটা পথে। সঞ্জয় ভাবছিল, অন্তর যখন এতটাই ভারাক্রান্ত, এতখানি আপ্লুত থাকে, নীরবতাই তখন দুজন মানুষের মাঝে মুখর ভাষা হয়ে ওঠে।

আর শ্রীতমা? তার ভাবনা তখন বয়ে চলেছিল ভিন্ন এক দিশায়। সে ভাবছিল, জয়ার কথা। অভিমান ক'রে যে তার অপরিচিত স্বামীর হাত ধরে অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াল। বলে গেল আর কোনদিন কাশী ফিরবে না।

আর জীবনের প্রতি, ভাগ্যের প্রতি, অব্যক্ত অভিমানে নিজের প্রাণটাই খুইয়ে বসল পবিত্র। পৃথিবী থেকেই চিরবিদায় নিল সে। আর রাজীব? শালিনীকে গভীর ভালবেসে, নিজের জীবন, নিজের কেরিয়র, নিজের পরিবার – সব কিছু হারিয়ে ফেলল সে। বিচারকের দরবারে ওর অপরাধের শাস্তি কি হবে জানে না শ্রীতমা। কিন্তু সে জানে যে ওর পরিচিত, বলিউডি ফিল্মের নায়কের মত সেই রাজীব, যাকে একদিন অনেক উঁচু স্তম্ভের ওপর দাঁড় করিয়ে শ্রীতমা ভালবাসত, পূজো ক'রত – আজ নিহত। যাকে একটু আগেই দেখে এল শ্রীতমা, সে রাজীবের প্রেতাত্মা।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যে, ভাগ্য শ্রীতমাকে হাত ধরে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে, নতুন এক পথে চালিত করেছেন।

রাগ, দুঃখ, তীব্র অভিমান – সব কিছু নিশ্চিহ্ন মুছে ফেলে আজ যে পথে চলতে আরম্ভ ক'রল শ্রীতমা, সে পথ নিরাপত্তার, বিশ্বাসের, ভালবাসার। আর সেই পথে ওর হাত ধরে চলবে ওর নিরন্ত সঙ্গী সঞ্জয়।

ভাবতে ভাবতে, আবেগে আপ্লুত শ্রীতমা হাত বাড়িয়ে, শক্ত ক'রে ধরে ফেলল সঞ্জয়ের হাত এবং শপথ নিল এই হাত আর কোনদিন সে ছাড়বে না।

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

স্বপ্না মিত্র

পাহাড় চুড়ো

পর্ব ১০ ও ১১

(১০)

বিকেল পাঁচটা বাজে। কলেজ ক্যান্টিন প্রায় খালি। শুধু দু-চারটে টেবিলে ছোট ছোট জটলায় এখনও আড্ডা চলছে। ক্যান্টিনের খাবারও ফুরিয়ে এসেছে, ফিশফ্রাই, মাটন-চপ উধাও, কয়েকটা শিঙাড়া আর প্যাটিস পড়ে আছে শুধু।

জানলার পাশে একদম কোণের টেবিলে সিদ্ধার্থ, সোমনাথ আর অতনু বসে। সিদ্ধার্থ বলল, "তিনটে শিঙাড়া নিয়ে আয় তো অতনু, অনেকক্ষণ হয়ে গেল খালি মুখে আছি, আর ভালো লাগছে না।"

অতনু উঠে যেতে সোমনাথের দিকে সিদ্ধার্থ হাত বাড়ায়, "একটা সিগারেট দে, মটকাটা ঠাণ্ডা করি।"

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে পুরোটাই সিদ্ধার্থর হাতে দিয়ে দেয় সোমনাথ। একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান মারে সিদ্ধার্থ, ঠোঁট দুটো সরু করে ধোঁয়া ছাড়ে, নিটোল ধোঁয়ার রিং হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে কেঁপে কেঁপে ভেঙে যায়।

সেদিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "অতসীর প্রতি আমার প্রেমও এমন নিটোল ছিল, তবু টিকলো না কেসটা, ভেঙে গেল। চলে গেল অতসী।"

অতসীর হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে। বিয়ের পরে সে চলে যাচ্ছে জার্মানিতে। বিয়ের খবর অতসী নিজের মুখে দেয়নি সিদ্ধার্থকে, সে বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছে সোমনাথের ঠিকানায়। অতসীর বিয়ের খবর জেনেছে থেকে সিদ্ধার্থকে আর সামলানো যাচ্ছে না, ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত আচরণ করছে সে, যাকে তাকে পাকড়াও করে উগরে দিচ্ছে মনের রাগ, দুঃখ, অভিমান। গত তিন ঘণ্টা ধরে সোমনাথ আর অতনুকে সামনে বসিয়ে সিদ্ধার্থ এরকম হাহুতাশ করে যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থর সিগারেট আধখানা শেষ হওয়ার আগেই শিঙাড়ার প্লেট নিয়ে ফিরে এসেছে অতনু, সে সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে, "অতসীদির রেকর্ড কিন্তু গোড়া থেকেই খারাপ, তোমার সঙ্গেই টানা এত বছর ছিল সিদ্ধার্থদা, নাহলে আঠেরো বছর বয়সেই নাকি ...।"

অতনুর কথা শেষ হয় না, সিদ্ধার্থ হুঙ্কার ছাড়ে, "শী ইজ মাই এক্স অতনু, বুঝেসুঝে কথা বলিস।"

সিদ্ধার্থর রোয়াবের সামনে সঙ্গে সঙ্গে অতনু মিইয়ে যায়, তবু মিনমিন করে, "যা বলছি ঠিকই বলছি। সলিড সোর্স থেকে পাওয়া খবর। ইনফ্যাক্ট বহুদিন আগে আমি সোমনাথকে বলেছিলাম, জানিনা তোমাকে সোমনাথ কেন সাবধান করে দেয়নি।"

সোমনাথ পড়ে মহা ফাঁপরে, সে আমতা আমতা করে বলে, "তুই বলেছিলি ফার্স্ট ইয়ারে, তখন তো অতসীদির সঙ্গে সিদ্ধার্থদার খুব ভাব। আর আমার অতসীদিকে কোনদিনই মন্দ লাগেনি, ভেরি সফট এন্ড কেয়ারিং লেডি। সত্যি কথা বলতে গেলে, তোর ওসব বুলশিট গল্প আমি বিশ্বাসও করিনি।"

অতনুর ঠোঁটে ব্যাঙ্গের হাসি, "আর এখন? এখন বিশ্বাস হচ্ছে?"

সোমনাথ উত্তর দেওয়ার আগেই সিদ্ধার্থ হিসহিস করে ওঠে, "সব সত্যি, সব।"

সোমনাথ অবাক হয়ে দেখে সিদ্ধার্থর প্রতিক্রিয়া, আর অতনু উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে আরও কিছু শোনার প্রত্যাশায়।

সিদ্ধার্থর মুখে হায়নার হাসি, "আমিও ছাড়িনি বুঝলি। প্রোটেকশন নিয়েছিলাম, তবে বিছানা অবধি নিয়ে গিয়েছি। ভালোই তো, জার্মানির দাদা সিদ্ধার্থ দত্তর এঁটো মাল খাবে, আর আমি ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে ফ্রেশ জিনিস ঘরে আনবো। এনিওয়ে, অতসীর বিয়ে জানুয়ারিতে হচ্ছে, আর আমার বোনের বিয়ে এপ্রিলে, মানে সামনের বৈশাখে। তোদের দুজনেরই নিমন্ত্রণ রইলো, আসা চাই-ই।"

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করে, "তোমার বোন?"

সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে বলে, "হ্যাঁ আমার বোন, তুই চিনিস তো শাশ্বতীকে, অতনু চেনে না, অতনু আমাদের বাড়িতে আসেনি কোনদিন।"

অতনু মুখ ফসকে বলে ফেলে, "না, আমি চিনি। পাড়াতে দেখেছি।"

সিদ্ধার্থর হাতের সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। জ্বলন্ত সিগারেটের শেষটুকু অ্যাশট্রেতে ঠেসে দিয়ে সে বলে, "হ্যাঁ, পাড়ার পুজোতে দেখেছিস নিশ্চয়ই। ওখানেই আমার মা আর বোন অঞ্জলি দিতে যায়।"

এদিকে শাশ্বতীর বিয়ের খবরে সোমনাথ যেন আকাশ থেকে পড়ে। বেশি দিন হয়নি, পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে সে আর শাশ্বতী কবিরাজি কাটলেট খেয়ে এসেছে। তখনও তো শাশ্বতী কিছু বলেনি! তবে তিন সপ্তাহ হয়ে গেল শাশ্বতী তার সঙ্গে দেখা করেনি, টাইম এন্ড প্লেস ফিক্স করেও যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছায়নি শাশ্বতী। পরে ফোন করে 'সরি' বলেছে সোমনাথকে। একটু একটু করে কুয়াশা সরে যাচ্ছে সোমনাথের চোখের সামনে থেকে, পরিষ্কার হয়ে উঠছে সব। তবে পরক্ষণেই সে নিজেকে ধমকায়, কক্ষণও না, কিছুতেই না, সিদ্ধার্থদা জানেই না তার বোনের মনের হদিশ।

বেচারা শাশ্বতী, গোঁড়া পরিবারের মেয়ে, বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করেছে। এখন শাশ্বতীর প্রয়োজন সোমনাথকে। সোমনাথের কর্তব্য মেয়েটাকে সাপোর্ট করা। অত চিন্তার কিছু নেই, ল্যান্সডাউন রোডের তিনতলা গোলাপি বাড়িটার দোতলায় সোমনাথ একবার উপস্থিত হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সিদ্ধার্থদা নিজের ভাইয়ের মত সোমনাথকে ভালোবাসে, শাশ্বতীর মা-বাবাও তো মন্দ ব্যবহার করেন না। অবশ্য শাশ্বতীর দাদু একটু কম কথা বলেন, সে ঠিক আছে, বয়স্ক মানুষ কী আর কথা বলবেন।

সোমনাথের ফ্যাকাসে মুখে আবার রক্ত ফিরে আসে, সে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে, "হঠাৎ শাশ্বতীর বিয়ে ঠিক হল? বিদেশের পাত্র নাকি?"

সোমনাথের মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির পরিবর্তন অন্যসময় হলে হয়তো সিদ্ধার্থর চোখে পড়তো। কিন্তু আজ সে নিজের মন নিয়েই এত ব্যতিব্যস্ত যে ওসব খেয়াল করে না।

সিদ্ধার্থ মাথা নাড়ে, "হঠাৎ নয়। অনেকদিন হল শাশ্বতীর জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে। দু-তিন জায়গা থেকে মেয়ে আগেও দেখে গিয়েছে। তবে সব মিলিয়ে এত দিন বিয়েটা মেটিরিয়ালাইজ করেনি। এই পাত্রটা খুব ভালো, মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা ডাক্তার, পাত্র ইঞ্জিনিয়ার। সল্টলেকে নিজেদের বাড়ি। সল্টলেক তো বর্তমানের বালিগঞ্জ। আর কী চাই!"

একটু গলা নামিয়ে সিদ্ধার্থ আবার বলে, "শুধু ভালো পাত্র নয়, মিঠুর খাঁই ছিল বড়লোক শ্বশুরবাড়ি। তা এদের পয়সা আছে।"

শাশ্বতীর বিয়ের বিশদ বিবরণ শুনে সোমনাথ আবার তলিয়ে যেতে শুরু করে, তার বুঝতে কোথাও গণ্ডগোল হচ্ছে না তো?

কিন্তু বোঝার তো কিছু নেই। এই পৃথিবীতে সবই বাইনারি, ইয়েস অর নো, ঢপ বা ফ্যাক্ট, মাঝামাঝি তো কিছু হয় না। শাশ্বতীর যদি সত্যিই অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে থাকে, এখন সোমনাথের কী করণীয়?

সিদ্ধার্থর সামনে সোমনাথের পক্ষে আর নির্লিপ্ত মুখে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। সিদ্ধার্থ আর অতনু দুজনেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে সে কৈফিয়ত দেয়, "সরি, আমার একটু কাজ আছে, এখন আমাকে রুমে ফিরতেই হবে।"

হোস্টেলে ফেরে সোমনাথ যেন একটা ঘোরের মধ্যে, তার মাথায় ক্রমাগতই ঘুরতে থাকে, শাশ্বতীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে, সামনের বৈশাখে তার বিয়ে!

শাশ্বতী তো ভালোবাসে সোমনাথকে। তাহলে শাশ্বতীর অন্যত্র বিবাহ কী করে সম্ভব? শাশ্বতীর ভালোবাসা প্রকাশে তো কোন রাখঢাক নেই। সেই আগ্রাসী ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করেছে সোমনাথ। কত সহজে সে নিজেকে মেলে ধরেছে সোমনাথের সামনে। তারপরও অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে?

সোমনাথ বুঝতে পারছে, শাশ্বতী খুব বিপদে পড়েছে, খুব।

হোস্টেলে পৌঁছেই সোমনাথ ফোন করে, ও-প্রান্তে ফোন ধরে চারুমাসি। কোন ভণিতা ছাড়াই আজ সোমনাথ সোজাসুজি বলে, "শাশ্বতীকে ডেকে দেবে চারুমাসি? দরকার আছে।"

চারুবালার গলায় খুব তাড়া, "বাড়িতে কুটুম এসেছে গো, মিঠু তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত। পরে ফোন করো।"

সোমনাথ তার স্বভাবগত শালীনতা বোধ অতিক্রম করে জিজ্ঞাসা করে ফেলে, "কোন কুটুম চারুমাসি? কে এসেছে?"

চারুবালা খুশি খুশি গলায় বলে, "নতুন কুটুম গো, মিঠুর বিয়ে বোশেখ মাসে, তাঁরা এসেছেন।"

ফোন রেখে সোমনাথ তার ডান হাতের মুঠি মুষ্টিবদ্ধ করে, তাঁরা মানে কারা? শুধু শ্বশুর শাশুড়ি নাকি পাত্র নিজেও এসেছে? কেমন দেখতে পাত্রকে? কী নাম? সিদ্ধার্থদা বলেছিল পাত্র এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনিয়ার তো সোমনাথও। তাহলে? কী করছে শাশ্বতী? মুখরা শাশ্বতী এখন মুখ খুলছে না কেন? ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে সোমনাথই মুখ খুলবে।

ল্যান্সডাউন রোডের তিনতলা গোলাপি বাড়িটার সবুজ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আজ সোমনাথের এক বিচিত্র অনুভূতি হল। প্রথমে এই বাড়ি, বাড়ির অন্দর, বাড়ির সদস্যরা প্রত্যেকেই ছিল অপরিচিত। অপরিচয়ের মোড়ক একটু একটু একটু করে উন্মোচিত হয়েছে, আর শুধু বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে নয়, বাড়িটার সঙ্গেও কখন যেন সখ্যতা গড়ে উঠেছে সোমনাথের। খুব মমতার সঙ্গে সে সবুজ দরজার ওপর হাত রাখে, ভেজানো দরজা খুলে যায়। সোমনাথ আর কলিংবেল বাজায় না, সবুজ দরজা দিয়ে ঢুকে সরু লন পেরিয়ে সোজা উঠে যায় দোতলায়।

দোতলায় উঠে ভিতরে ঢুকে সোমনাথ নিজের ভুল বুঝতে পারে। ডাইনিং স্পেসের এক পাশে চেয়ারে প্রতিমা বসে, তার শাড়ি হাঁটুর ওপর তোলা, প্লাস্টিকের লাল রঙের গোল টব ভর্তি জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে আছেন। আর চারুবালা মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে ব্রাশ দিয়ে প্রতিমার পা ঘষছে। হঠাৎ সোমনাথকে ঘরের মাঝে দেখে শশব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রতিমা। তাড়াতাড়ি হাঁটুর ওপর থেকে টেনে শাড়ি নামায়। চারুবালাকে ইশারা করে ভেজা পা আর শাড়ি সামলে চলে যায় শোয়ার ঘরে।

চারুবালার চোখে বিস্ময়, "বেল বাজাওনি কেন? একেবারে সোজা দোতলায় উঠে এসেছ যে?"

সোমনাথ জানে এটা কোলকাতা, সুকুরগ্রাম নয়, না জানিয়ে কোন বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করা অসভ্যতার সমান।

সোমনাথ মনে মনে শাশ্বতীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনে এত ব্যস্ত ছিল যে সাঙ্ঘাতিক ভুল করে ফেলেছে। সোমনাথ লাজুক হাসি হাসে, "সেই তো, দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছি।"

ড্রয়িংরুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে চারুবালা বলে, "তুমি ওখানে বসো, বাবুয়া বেরিয়েছে। পাড়ার দোকানে গিয়েছে, এক্ষুনি এসে যাবে। চা খাবে?"

সোমনাথের চোখমুখ কাতর দেখায়, গলা খাদে এনে বলে, "চারুমাসি, শাশ্বতী আছে? একটু ডেকে দাও প্লিজ, দরকার আছে।"

চারুবালা অবাক হয় সোমনাথের ভাবভঙ্গী দেখে, তার চোখে সন্ধানী দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে, "মিঠু? মিঠু ঘুমোচ্ছে। জানো তো দুপুরেও সে অঘোরে ঘুমোয়।"

সোমনাথের গলা অধৈর্য শোনায়, "প্লিজ ডেকে দাও চারুমাসি, তাড়াতাড়ি ডেকে দাও।"

"আরে আমি বাইরে ছিলাম। কতক্ষণ হল এসেছিস?" সোমনাথের পিছন থেকে সিদ্ধার্থ বলে।

সোমনাথ বোঝে, একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। শাশ্বতীর বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে আবেগতাড়িত হয়ে এইভাবে তাড়াহুড়ো করে এখানে চলে আসা ঠিক হয়নি। তার উচিত ছিল শাশ্বতীর সঙ্গে অন্যত্র দেখা করা। কিন্তু শাশ্বতীকে ফোনে ধরাও তো যাচ্ছিল না! তাই সে সশরীরে হাজির হতে বাধ্য হয়েছে। তবে এসেই যখন পড়েছে, খোলাখুলি কথা হয়ে যাক।

সোমনাথের গলা শুকনো শোনায়, "পাঁচ মিনিট।"

সোমনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করে, "এনি প্রবলেম সোমনাথ? আর ইউ আপসেট?"

সোমনাথের মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়, শরীরটা হাল্কা লাগে, সে মরীয়ার মত বলে, "সিদ্ধার্থদা, আই নিড ইয়োর হেল্প, আই অ্যাম ইন আ জেনুইন প্রবলেম।"

সিদ্ধার্থর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, সে বলে, "আমার ঘরে চল। কেসটা ওখানে বসে ডিসকাস করি। চারুমাসি, দু-কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো আমার ঘরে।"

সোমনাথ কিন্তু নড়ে না। সে স্থির গলায় বলে, "প্লিজ শাশ্বতীকে ডেকে দাও সিদ্ধার্থদা, তোমার সঙ্গে নয়, শাশ্বতীর সঙ্গে আমার প্রয়োজন। শাশ্বতীর সঙ্গে আগে আমার কথা বলা দরকার।"

সোমনাথ অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ, তার ব্যবহার নম্র ও বিনয়ী। সেই সোমনাথের এরকম জেদি আচরণ দেখে মুহূর্তের জন্য সিদ্ধার্থ থমকে যায়, তারপরই তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "হোয়াই? হঠাৎ মিঠুকে তোর প্রয়োজন কেন?"

সোমনাথ শান্ত গলায় বলে, "শাশ্বতীকে ডেকে দাও, তার উত্তর শাশ্বতী জানে।"

সিদ্ধার্থর গলা চড়ে যায়, "বেশি ভ্যানতাড়া মারিস না সোমনাথ, কী ব্যাপার তাড়াতাড়ি খুলে বল।"

সোমনাথ বলে, "ঠিক আছে, তবে শোনো। আমরা দুজন পরস্পরকে ভালোবাসি। আমি শাশ্বতীকে বিয়ে করতে চাই।"

সিদ্ধার্থ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, এ বলে কী সোমনাথ! মিঠুর সঙ্গে সোমনাথের বিয়ে? সোমনাথের মাথার ঠিক আছে তো? আর প্রেম? প্রেম হল কখন দুজনের?

সিদ্ধার্থ আর সোমনাথের কথার মাঝে কখন যেন শোয়ার ঘর থেকে প্রতিমা বেরিয়ে এসেছে। প্রতিমার পিছন পিছন অবিনাশও এসে দাঁড়িয়েছে ডাইনিং-স্পেসে।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে এক ফাঁকে চারুবালা টুক করে ঢুকে পড়েছে শাশ্বতীর ঘরে। ঘুমন্ত শাশ্বতীকে নাড়া দেয় সে। তিন-বার ধাক্কা দেওয়ার পরে শাশ্বতী চোখ খুলতেই চারুবালা বলে, "সোমনাথ এসেছে। তোমার সঙ্গে নাকি তার ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক? তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে যাও। বাবুয়া যা রগচটা, সোমনাথের গায়ে না হাত তুলে দেয়।"

চারুবালা প্রদত্ত সংবাদ শুনে শাশ্বতীর চোখ থেকে এক নিমেষে ঘুম উড়ে গিয়েছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানায়।

শাশ্বতীর চোখমুখের ভাব চারুবালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। সে বোঝে, সোমনাথ যা বলেছে তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

মিঠুকে ছোট থেকে দেখছে চারুবালা। সে জানে, মিঠু স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী। চারুবালার উদ্বেগ হয় নিরীহ সোমনাথের পরিস্থিতির কথা ভেবে। সে শাশ্বতীর পিঠে ঠ্যালা দেয়, "তাড়াতাড়ি যাও বাইরের ঘরে, এদের তো চেন, একটা অনর্থ না হয়ে যায়।"

শাশ্বতীকে দেখে সোমনাথ যেন হাঁফ ছাড়ে। সে তড়বড় করে বলে ওঠে, "ওই তো, শাশ্বতী এসে গিয়েছে, তুমি নিজেই জিজ্ঞাসা করো সিদ্ধার্থদা।"

সিদ্ধার্থ জ্বলন্ত চোখে শাশ্বতীর আপাদমস্তক দেখে, সোমনাথের দিকে ফিরে ব্যাঙ্গের হাসি হাসে, "মিঠুর সঙ্গে তোর কত দিনের পরিচয়? আমার বোনকে আমি খুব ভালো করে চিনি। তোর মত চাষার ছেলেকে মিঠু জীবনেও বিয়ে করবে না।"

হঠাৎ "চাষার ছেলে" সম্বোধনে সোমনাথ কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, অপমানে তার গা রিরি করে ওঠে। অনেক আশা নিয়ে সে তাকায় শাশ্বতীর দিকে, শাশ্বতী চোখ ফিরিয়ে নেয়। প্রতিমা বলে, "দু-বছর ধরে মিঠুর পাত্র দেখা চলছে। মেয়ে সেজেগুজে পাত্রের সামনে বসেওছে। কই, কোনদিন তো মিঠু তোমার কথা বলেনি, কোনরকম আপত্তিও জানায়নি। তাহলে?"

অবিনাশ হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গী করে, "আহ, তুমি হলে মহিলা, চুপ করে থাকো তো। এ হল বাবুয়ার বন্ধু, বাবুয়া বন্ধুকে ঘরে এনেছে, এখন বাবুয়া বুঝুক, বাবুয়াকে সামলাতে দাও।"

শাশ্বতীকে উদ্দেশ্য করে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করে, "সুকুর গ্রামের বাড়িতে ধান সেদ্ধ করতে তোর আপত্তি নেই মিঠু? মার্সিডিজ নয়, নিজেদের গরুর গাড়িতেই তুই খুশি তো?"

অবিনাশ ফুট কাটে, "শুধু ধান সেদ্ধ? সকালে উঠে গরুর দুধ দোয়াও আছে।"

এত অপমানের মাঝে শাশ্বতী একটা জবাব দেয় না, প্রতিবাদ করে না, চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

পুরো পরিস্থিতিটা অসহ্য লাগে প্রতিমার। অবিনাশের দাবড়ানি উপেক্ষা করে সে আবার বলে, "তোমাদের কথাবার্তার ছিরি বুঝি না বাপু। সুকুর গ্রামে মিঠুর বিয়ের প্রশ্ন আসছে কেন? সোমনাথের সঙ্গে মিঠুর সম্পর্ক ছিল, এমন অপবাদ আমাদের মেয়ের নামে শুনবো কেন?"

এক মুহূর্তের জন্য শাশ্বতী চোখ তুলে তাকায় সোমনাথের দিকে।

অবিনাশ গর্জে ওঠে, "নিজের ঘরে যাও মিঠু, ছেলে ছোকরার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পোঁদ দেখানোর দরকার নেই।"

সোমনাথ স্তম্ভিত হয়ে যায় অবিনাশের মুখের ভাষা শুনে। সোমনাথের মুখের অভিব্যক্তি খেয়াল করে সিদ্ধার্থ বলে, "ইয়েস। আমরা জমিদার পরিবার। খুব রক্ষণশীল। উই প্রোডিউস ভার্জিন। আমার বোন আর অতসীর মাঝে ফারাক আছে। আর হ্যাঁ, বামন হয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টা করিস না। ফল ভালো হবে না।"

সেদিন ল্যান্সডাউন রোডের তিনতলা গোলাপি বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কোন অ্যাকসিডেন্ট ব্যতীত সোমনাথ যে অক্ষত শরীরে হোস্টেলে ফিরে এসেছিল, সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা।

দোতলা থেকে নেমে, সবুজ দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে, রাস্তায় পা রেখে, সোমনাথ যেন অনেকক্ষণ পরে বুক ভরে শ্বাস নেয়। আহ, এই তো বাতাসে কত অক্সিজেন। ওই গোলাপি বাড়িটার সুসজ্জিত দোতলায় কী ভীষণ ঘুটন, তার দম আটকে আসছিল!

ওই বাড়িটার অন্দরমহলে সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে দাঁড়িয়ে এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নেই, প্রচেষ্টা নেই। অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে মৃত জমিদারির মত নিজেরাও মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে।

কারা অভিজাত? কাদের অভিজাত বলে? আভিজাত্যের সংজ্ঞা কী? প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক চাষাভুষো সোমনাথের বাবার থেকে সিদ্ধার্থদার বাবা কি বেশি অভিজাত? কী অসভ্যের মত মুখের ভাষা! সোমনাথ বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছে। এই বাড়ির জামাই হলে আজীবন তাকে এমন আভিজাত্যের সঙ্গে ঘর করতে হত।

এক মুক্ত বিহঙ্গের অনুভূতি হয় সোমনাথের। পরক্ষণেই শরীর মুচড়ে ওঠে ব্যথায়, যে শরীর শাশ্বতীকে কামনা করেছিল, যে কামনার আগুন উসকে দিয়েছিল শাশ্বতী স্বয়ং। কমলালেবুর কোয়ার মত টুসটুসে ঠোঁটে প্রেম ছিল না, প্রেম প্রেম খেলা ছিল?

ডাইনিং টেবিলের চেয়ারের পাশে নিশ্চুপ শাশ্বতীর চেহারাটা ঝলসে ওঠে সোমনাথের মনে। শুধু শাশ্বতী নয়, নিজের প্রতিও ঘৃণা বোধ হয় সোমনাথের। মনের কোণা কোণা থেকে স্মৃতিরা গুঁতোগুঁতি শুরু করে দেয়।

সেই চুয়াল্লিশ নম্বর বাস থেকে শুরু। গ্লোবে এক সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া। কথায় কথায় শাশ্বতী আঁকড়ে ধরত সোমনাথের হাত। তারপর একদিন হোস্টেলে সোমনাথের ঘরে চলে এলো রূপকথার রাজকন্যা। দু-কূল ভেসে গেল তার।

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল সোমনাথ। হোস্টেল গামী বাস আসছে, থামছে, চলে যাচ্ছে। তার কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই। অপমানে জ্বলে যাচ্ছে শরীর। শুধু তো প্রেমে প্রতারণা নয়, আজ সোমনাথের কারণে তার জন্মস্থান, তার মা-বাবার অপমান হল।

সোমনাথও দেখে নেবে এই নরকের গুষ্টিকে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত তাকে হতেই হবে। সে উঠবে, অনেক উঁচুতে উঠবে। সিদ্ধার্থর থেকে অনেক অনেক ওপরে, পাহাড় চুড়োয়।

(১১)

সোমনাথের ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল। হাল্কা ঘুমের মধ্যেও সে টের পায় এরিনা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। এরিনা বিছানা থেকে উঠে গেল মানে রাত শেষ, পূব দিগন্তে সূর্যোদয়ের সময় হয়ে এসেছে।

এরিনার শরীরে যেন ইন-বিল্ট ক্লক লাগানো আছে, তিনশো-পঁয়ষট্টি দিন তার ঘুম ঠিক ভোর পাঁচটায় ভেঙে যায়। গ্রামের ছেলে সোমনাথের শৈশব থেকেই ভোরে ওঠার অভ্যাস। ভোরবেলা মোরগের প্রথম ডাক ছিল তাদের ঘুম থেকে ওঠার অ্যালার্ম। কিন্তু ইটালির মেয়ে এরিনার প্রতিদিন এই ভোর পাঁচটা থেকে দিন শুরু করার অভ্যাস অবাক করেছিল সোমনাথকে।

এরিনা হেসেছিল, "আরে বাবা, গ্রাম আর শহর, দিন তো সেই চব্বিশ ঘণ্টার। ইউ নিড আ প্ল্যান, আ স্ট্র্যাটেজি। ভোর ভোর দিন শুরু করলে অনেকটা সময় পাওয়া যায়, দিনগত আউটপুট হয় বেশি। আর কে না জানে, বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু হয়। প্রতিদিন আ ফিস্টফুল মোর ওয়ার্ক মেকস আ ম্যাজিক, সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ।"

সোমনাথ নীরবে ভেবেছিল, ঠিক কথা, এবং এইখানেই তৃতীয় বিশ্ব ও প্রথম বিশ্বের তফাৎ। প্রথম বিশ্বের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বেশি, রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেকেরই কম-বেশি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ আছে, তারা স্বাস্থ্যের মূল্য বোঝে, সময়ের কদর জানে। চালাকি নয়, সমস্যার মোকাবিলা করে মুখোমুখি। আর মানুষ নিয়েই দেশ, প্রতিটি দেশবাসী যদি নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা করে, তাহলে দেশও সামনে এগোয়।

সোমনাথ পাশ ফিরে শোয়, গড়িয়ে যায় এরিনার ছেড়ে যাওয়া বিছানার অংশে, ব্ল্যাঙ্কেটের মধ্যে দু-পা দু-পাশে টানটান করে ছড়িয়ে দেয়, দু-হাত রাখে মাথার ওপর। বিছানায় এরিনার ছেড়ে যাওয়া স্পেসটুকু পেয়ে সোমনাথ কি খুব খুশি হল?

তবে এরিনার সঙ্গে তার সম্পর্কে স্পেসটুকু সোমনাথ খুব উপভোগ করে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে স্পেস বড় মূল্যবান ফ্যাক্টর, তাতে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এরিনার প্রতিটি কাজের হিসেব যেমন সোমনাথ রাখে না, সোমনাথের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়েও তেমন এরিনা পদে পদে কৈফিয়ত চায় না। সোমনাথ আর এরিনা যে যার নিজের মতন বিন্দাস আছে তাদের বিবাহিত জীবনে।

নাহলে সোমনাথের অফিস-কলিগ মিস্টার রায়ের যা অবস্থা! মিস্টার রায়ের সব দিকে মিসেস রায়ের কড়া নজর, পার্টিতে মিস্টার রায় ক-পেগ স্কচ নেবেন থেকে শুরু করে খাওয়ার শেষে রসগোল্লার সংখ্যা অবধি, সবতাতেই মিসেস রায় মন্তব্য করেন।

এরিনা অবশ্য মিসেস রায়ের পক্ষে। এরিনা বলে, মিস্টার রায় তোমার মত সহজ সরল মানুষ নয় সোমা, খুব খুঁতখুঁতে পার্সোনালিটি। নিশ্চয়ই প্রাইভেট লাইফে মিসেস রায়কে খুব জ্বালায়, সর্বসমক্ষে মিসেস রায় তারই শোধ তোলে।

কিন্তু সোমনাথ কি সত্যিই সহজ সরল মানুষ? নাকি উদাসীনতা তার বর্ম, এক ধরনের প্রিটেনশন? সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে নাক গলানো তো বেশ পরিশ্রমের কাজ, পণ্ডশ্রমও বলা যায়।

সোমনাথ জানে, ঘুম থেকে উঠে এরিনা ঢুকেছে স্টাডিতে। স্টাডির একপাশে চা-কফির সরঞ্জাম রাখা, বড় এক কাপ কফি তৈরি করে এরিনা এখন ল্যাপটপের সামনে। নিজের মেল-বক্স চেক করে, দরকারি মেলের উত্তর দিয়ে, ফেসবুক আর টুইটার ঘুরে ঠিক ছ'টা নাগাদ এরিনা চলে যাবে নীচে, মর্নিং-ওয়াকে। পাতলা ঘুমটাকে আলগোছে জড়িয়ে বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়েছিল সোমনাথ, সিঁড়ি দিয়ে এরিনার পায়ের শব্দ নীচে মিলিয়ে যেতে সে উঠে বসে। দেওয়াল ঘড়িতে সময় দেখে, ছ'টা দশ।

সোমনাথ বিছানা থেকে ওঠে, হাল্কা পেস্তা রঙের পশমিনা শালটা গায়ে জড়িয়ে উডেন ডেকে এসে দাঁড়ায়। এটা বাড়ির পশ্চিম দিক। তাই ডেক থেকে সূর্যোদয় দেখা যায় না, তবে সূর্যের প্রকাশ বোঝা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে, আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে কুসুম কুসুম কমলা রঙ, আর একটু একটু করে সরে যাচ্ছে চারপাশের ওপর থেকে অন্ধকারের চাদর।

এমন ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রকৃতি বড় বাঙময় হয়ে ওঠে। তখন কোন সঙ্গী নয়, কোন কথোপকথন নয়, উডেন ডেকে দাঁড়িয়ে একা কান পাতে সোমনাথ। ওই যে দূরে আকাশের গায়ে গা লাগিয়ে পাহাড়িয়া, সামনে ধুধু সবুজ আঙুর ক্ষেত, সোমনাথের মনে উসকে দেয় ধানক্ষেতের স্মৃতি। তবে ধানক্ষেতের মত আঙুর ক্ষেতে হাওয়ার দোলা লাগে না।

তবু ব্যস্ত শহরে বাস করার থেকে ন্যাপাভ্যালির এই নিরালা কোন অনেক মধুর লাগে সোমনাথের, এখানে শহুরে সুখসুবিধার সঙ্গে সবুজের বিস্তার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ঘরের বাইরে এত ভোরে বেশ ঠাণ্ডা, সোমনাথ শালটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে এক চিলতে হাসি।

কে বলে সোনার পাথরবাটি হয় না? অ্যামেরিকায় এই ধরণের প্রপার্টি সোনার পাথরবাটির মতই, শহুরে সুখ আর গ্রামের রোমান্টিকতা দুটোই একই প্লেটে একসঙ্গে সার্ভ করা হয়েছে যেন।

দূষণ মুক্ত বায়ু, বিশুদ্ধ জল, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও অন্তর্জালের সুবিধার সঙ্গে যেদিকে চোখ যায় শুধু ধুধু সবুজ। এবড়ো খেবড়ো মেঠো পথের চ্যালেঞ্জ নেই, রাস্তা এবং দূরভাষ দু-ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ব্যবস্থা মাখনের মত মসৃণ।

আরও কম জনবহুল স্টেটে, একই মূল্যের র‍্যাঞ্চ প্রপার্টিতে, এক টুকরো লেক, আংশিক নদী বা এক ফালি পাহাড় সোমনাথের নিজের হতে পারতো। সোমনাথ তখন আক্ষরিক অর্থে বলতো, "আমার একটা নদী আছে..."। সেই নদীতে সোমনাথ ইচ্ছে মত মাছ ধরত, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বোটে করে ঘুরে বেড়াত নদীর বুকে।

গ্রামের পুকুরে ছিপ ফেলে কত মাছ ধরেছে সোমনাথ। সুদূর অ্যামেরিকায় জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে এই যে প্রকৃতির মাঝে সে নিজের ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়েছে, মনে মনে তার জন্য ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জানায় সোমনাথ, গোপনে তৃপ্তির শ্বাস ফেলে। ওই যে দূরে, কুকুর নিয়ে হাউস হেল্পার হাঁটতে বেরিয়েছে। হাউস হেল্পারের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে, সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে এগিয়ে, ওরা রিল্যাক্স হাউসের দিকে চলে গেল।

সোমনাথের ফ্রী-মন্টের বাড়ির সুইমিং পুলটা এত ভালো ছিল না, এই পুলটা লম্বায় চওড়ায় বেশ বড়। সোমনাথের সাঁতার দেখে একদিন এরিনা বলেছিল, "কী দারুণ ডাইভ দাও সোমা। এত ভালো সুইমিং শিখলে কোথায়?"

সোমনাথ হেসেছিল, "গ্রামের ছেলে আমি, বটগাছের ডাল থেকে পুকুরের জলে ডাইভ দেওয়ার অভ্যাস ছিল। সেই পুকুর যেমন আয়তনে বড়, তেমন গভীর। তার পাশে এই সুইমিং পুল তো নস্যি, বাচ্চাদের রঙিন খেলনার মত। এখানে ডাইভ দেওয়া কোন ব্যাপার নাকি!"

গাছের ডাল থেকে ডাইভ দেওয়ার চিত্রটা এরিনার ঠিক বোধগম্য হয় না, সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হোয়াট?"

সোমনাথ হেসেছিল, "তোমরা ডাইভ দাও সুইমিং পুলে, আমরা ঝাঁপ দিতাম পুকুরের জলে। তোমাদের মত সুইমিংয়ের বিভিন্ন স্ট্রোকের টেকনিক্যাল নাম জানতাম না। কিন্তু ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার, সবই আয়ত্তে ছিল। হাওড়ায় পিসীর বাড়িতে গেলে গঙ্গাতেও সাঁতার কেটেছি।"

বর্ধমানে সোমনাথের সঙ্গে এরিনা বিশেষ করে দেখতে গিয়েছিল পুকুরের জলে গ্রামের ছেলেদের স্নান। পুকুর পাড়ে দেখা হয়েছিল বনলতার সঙ্গে, বনলতা পুকুরের জল নিয়ে কলসি কাঁখে বাড়ি ফিরছিল। এরিনা আবার শখ করে বনলতার কলসি নিজের কাঁখে নেয়, দু-পা এগোতেই সেই কলসি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেয়েছিল। সাতসকালে উডেন ডেকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সেই দৃশ্য মনে পড়ে যায় সোমনাথের, সে নিজের মনে হেসে ফেলে।

পুকুর, বনলতা, এরিনা, পুকুরের উল্টোদিকে মাটির বাড়ি, ভেরেণ্ডা গাছের বেড়া, বেড়ার পাশে পরপর দুটো কলকে ফুলের গাছ, একটা হলুদ, অন্যটা সাদা। মাটিতে বিছিয়ে আছে কলকে ফুল আর ঈষৎ বাদামি তিনকোণা ফলগুলো। কলকে ফুলের পিছনে মুখ লাগিয়ে টানলে বিন্দু বিন্দু মিষ্টি মধু ঠেকে জিভে, আর শুকনো ফলগুলো দিয়ে ইন্তিবিন্তি খেলে বনলতারা। মাটির দেওয়াল বেয়ে লতিয়ে টালির ছাদে উঠে গেছে লাউগাছ। বাংলার গ্রামের এক সাদা মাটা চিত্রপট, যেখানে এরিনা ভীষণ ভীষণ বেমানান।

তবে সোমনাথ মানিয়ে গিয়েছে অ্যামেরিকার মাটিতে, আদবকায়দায় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায়। মানিয়ে গিয়েছে বাইরের খোলসে, পাসপোর্টের ডিটেইলসে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে? ভিতর বাড়ির পরিবর্তন অত সহজ নয় বোধহয়। কলমের আঁচড়ে নাগরিকত্ব বদলে যায়। কিন্তু স্মৃতির আলো? তাকে এক ফুঁয়ে নেভায় সাধ্যি কার!

আজও শয়নে স্বপনে সুকুর গ্রাম তাড়া করে ফেরে সোমনাথকে, অ্যামেরিকায় সোমনাথের স্নিগ্ধ-শান্ত, সুখী-বিত্তবান জীবনে মাঝেমাঝেই বুদ্‌বুদের মত ভেসে ওঠে ছোটখাটো কত পুরনো ঘটনা। দিল্লীর কথা তার অত মনে পড়ে না। কিন্তু

কোলকাতার স্মৃতি আজও টাটকা তার মনে। আকাশে কুসুম কুসুম কমলা রঙ সরে এখন হালকা রোদের আভাস, উডেন ডেক থেকে ভিতরে ঢুকে আসে সোমনাথ।

ফ্যামিলি রুমে এসে সোমনাথ এক কাপ চা বানায়। ফিনফিনে সাদা বোন চায়নার কাপে হালকা সোনালি সুরভিত চায়ে চুমুক দিয়ে সে ল্যাপটপ খোলে, টিভি অন করে দেয়। লো-ভল্যুমে টিভি চলতে থাকে, সোমনাথ মাউস ক্লিক করে খবরের কাগজের পাতা ওলটায়। একটা কাগজ পড়ে না সে, একাধিক কাগজ পড়ে। শুধু নিজের দেশ নয়, বিভিন্ন দেশের কাগজ পড়া চাই তার। খবরের কাগজ পড়া শেষ করে সোমনাথ তার ই-মেল খোলে।

সোমনাথ মেল চেক করছিল, মর্নিং-ওয়াকের পরে কখন এরিনা ফিরে এসেছে সে তা টেরও পায়নি।

হঠাৎ ওপেন কিচেন থেকে এরিনা ডাকে, "সোমা, নাউ ব্রেকফাস্ট টাইম, চলে এসো।"

এরিনার ডাকে ল্যাপটপ বন্ধ করে সোমনাথ, কিচেনে যায়। মর্নিং ব্রেকফাস্ট হাউস-হেল্পার তৈরি করে দেয় না, তারা নিজেরা করে নেয়। অবশ্য তাদের ব্রেকফাস্ট মেনু খুবই সিম্পল, ফ্রেশ ফ্রুট জুস, টোস্ট আর সানি সাইড আপ। টোস্ট আর ডিমের পোচ তৈরি করে এরিনা, ফল কেটে জুস বানায় সোমনাথ।

আজ বাস্কেটে বাগানের অরেঞ্জ আর গ্রেপফ্রুট ছিল। অরেঞ্জ আর গ্রেপফ্রুটের মিক্সড জুস তৈরি করে সোমনাথ। জুসের জাগের পাশে দুটো গ্লাস রেখে ওপেন কিচেনের সামনে রাখা বার টুলে সে পা ঝুলিয়ে বসে, গ্লাসে জুস ঢেলে এগিয়ে দেয় এরিনার দিকে।

পোচের কুসুম যেন ফেটে না যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ফ্রাইং প্যান থেকে ডিমের পোচ প্লেটে স্থানান্তরিত করে এরিনা। টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞাসা করে, "এ মাসে মিউচুয়াল ফান্ড থেকে তোমার রিটার্ন কেমন?"

হাফ-প্যান্ট, টি-সার্ট, মাথায় টুপি, পায়ে গার্ডেন বুট, হাতে গ্লাভস পরে এরিনা আর সোমনাথ বাগানে ঘুরছিল। মুরগীদের থাকার চত্বরটা পিকেটিং ফেন্স দিয়ে ঘেরা, তার পিছনের অ্যাপ্রিকট গাছে এত অ্যাপ্রিকট হয়েছে যে পাতা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। পাকা টুসটুসে কমলাটে হলুদ রঙের অ্যাপ্রিকটে ভরে আছে গাছটা।

একটু এগিয়ে পরপর তিনটে ন্যাসপাতি গাছ, তার মধ্যে একটা গাছে গিজগিজ করছে ন্যাসপাতি। এই ন্যাসপাতিগুলো দেখতে খুব সুন্দর, বোঁটার দিকটা লালচে আর বাকিটা সবুজ। গাছটার চারপাশে ভনভন করছে এত এত বোলতা। তবে বোলতাদের যত কৌতূহল ওই ন্যাসপাতি ঘিরেই, আশেপাশের মানুষকে তারা চট করে কামড়ায় না। আপেল গাছে এখনও ফল ধরেনি, তবে গাছ ভরে রাশি রাশি গোলাপি রঙের ফুল এসেছে।

বাগানে মোট আটটা কমলালেবু গাছ, সব গাছ একসঙ্গে ফল দেয় না, তাই সারাবছরই কোন না কোন গাছ থেকে কমলালেবু পাওয়া যায়। গ্রেপফ্রুট গাছ দুটোতে এত বেশি ফলন! গ্রেপফ্রুট দেখতে অনেকটা বাতাবিলেবুর মত। সোমনাথদের গ্রামের বাড়ির পিছনে একটা বাতাবিলেবু গাছ ছিল, তবে সেই গাছে প্রতি বছর ফল হত না, আর হলেও হাতে গোনা কয়েকটা।

চেরি গাছে এখনও ফুল আসেনি। পাতিলেবু গাছগুলোর দিকে তাকালে সোমনাথের মায়া হয়, গাছগুলো বারোমাসই লেবুতে ভরে থাকে, এদিকে খাওয়ার লোক নেই।

এরিনা তাড়া দেয় সোমনাথকে, "স্ট্রবেরি গাছের গোড়াগুলো আলগা করে চলো সবজির বাগানে যাই, বেগুন গাছের পাতায় পোকা লেগেছে, ওষুধ দেব।"

প্রপার্টির বাগান সংক্রান্ত কাজের জন্য হাউস-হেল্পার ছাড়াও গার্ডেনার আছে। তবু সবজির বাগানের দেখাশোনা সোমনাথ নিজে করে। সোমনাথের সঙ্গে সঙ্গে থেকে এরিনাও শিখে নিয়েছে বাগানের কাজ।

প্রতিদিন ব্রেকফাস্টের পরে তারা দুজনে নিয়ম করে বাগানে ঘোরে। ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সবজির বাগান সরেজমিনে তদন্ত করে নেয়। তারপর পুলে গা ডুবিয়ে বসে কিছুক্ষণ। যতক্ষণে তারা বাড়ি ফেরে, হাউস-হেল্পার লাঞ্চ তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে রেখে অন্য কাজে চলে যায়।

আজ সবজির বাগানে এসে সোমনাথ দেখে শসা গাছের মাচা একপাশে ঝুলে পড়েছে। সে মাচা ঠিক করে বেঁধে চারটে শসা প্যান্টের পকেটে আর দুটো শসা হাতে নিয়ে এরিনার পাশে এসে দাঁড়ায়।

এরিনা গাজর তুলছিল, ইতিমধ্যেই সে গোটা দশেক গাজর তুলে এক পাশে রেখেছে। গাজরগুলোর মধ্যে কয়েকটা লাল রঙের, বাকিগুলো কমলা, কোনটা লম্বা, কোনটা বেঁটে, কোনটা সোজা, কোনটা নীচের দিকে ঈষৎ কোঁচকানো। অর্থাৎ প্রতিটি গাজর স্বতন্ত্র, রূপে ভিন্ন।

সোমনাথ বাধা দেয় এরিনাকে, "হয়েছে হয়েছে, অনেক হয়েছে, আর উঠিও না। বিটরুটগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, হোয়াইট-পারসনিপও তোলা দরকার।"

এরিনার মুখে চকচকে হাসি, "এই হচ্ছে অরগ্যানিক ভেজিটেবল, বুঝলে। বাজারের গাজর দেখেছ? এত লম্বা আর মোটা।"

সোমনাথের গলায় আপসোসের সুর, "আমরা তো নিজেদের ক্ষেতের সবজি খাচ্ছি, হান্ড্রেড পার্সেন্ট অরগ্যানিক। জুলি, মিলি আর জয়ের জন্য খুব চিন্তা হয়। কী যে হয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবী! আকাশ, জল, মাটি সর্বত্রই দূষণ, ভেজাল। ছোটবেলায় আমরা খাঁটি জিনিস খেতাম, বাড়ির গরুর দুধ, কেমিক্যাল সার ছাড়া সবজী, নিজেদের বাগানের ফল। এখন তো সবই প্রসেসড ফুড, এঁরা খাঁটি জিনিসের মর্ম বুঝবে কি করে?"

এরিনা মাথা নাড়ে, "বুঝবে না। তুমি খাওয়াদাওয়ার কথা বলছ, এদের আদ্ধেক সম্পর্কও খাঁটি নয়, প্রয়োজনের সম্পর্ক। রিয়েল লাইফ নয়, এরা ভার্চুয়াল জগতের অধিবাসী।"

সোমনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "হয়তো ভার্চুয়াল জগৎই শেষ অবধি আমাদের ডেস্টিনি। এনিওয়ে, তুমি বিটরুট ওঠাও, আমি কয়েকটা বেগুন আর বেলপেপার নিয়ে আসি।"

সবজির বাস্কেট ব্রকলির আইলের পাশে রেখে এরিনা ঢোকে মুরগীদের চত্বরে। এরিনাকে দেখেই মুরগীগুলো আনন্দে ঝটপট করে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে সোমনাথ মৃদু হাসে, ভাবে, মানুষ থেকে পশুপাখি সবার কাছেই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার এরিনার এক আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা আছে!

রিল্যাক্স-হাউসের সামনের লনে আউটডোর ফার্নিচার, একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার রাখা আছে। তার অদূরে লনের ঘাসের ওপর সাজানো জায়েন্ট চেস-বোর্ড, সোমনাথ শখ করে বসিয়েছে।

বাগানের কাজ শেষ করে সোমনাথ আর এরিনা এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো লনের চেয়ারে। রিল্যাক্স-হাউসের ফ্রিজে বিয়ারের ক্যান রাখাই থাকে। হোয়াইট-কলার কাজে অভ্যস্ত দুজনেই শারীরিক পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সোমনাথ ভিতর থেকে দুটো ক্যান নিয়ে এলো।

ক্যালিফোর্নিয়া মূলত মরুভূমি, সরাসরি সূর্যের আলো গায়ে লাগলে মনে হয় রোদ্দুর যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। রিল্যাক্স-হাউসের এদিকে বেশ কয়েকটা বড় বড় রেডউড-ট্রি দাঁড়িয়ে, তাদেরই ঘন ছায়া পড়েছে সামনের লনে। বাগানে রোদে

এতক্ষণ একনাগাড়ে ঘোরাঘুরির পরে গাছের নরম ছায়ায় বসে বড় আরাম লাগছিল সোমনাথের, সে ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল সামনের রেডউড-ট্রির মোটা গুঁড়িটার দিকে ...

এরিনা নাড়া দেয় সোমনাথকে, "কি ভাবছো এত?"

সোমনাথ বলে, "কিছু না, এমনিই। আমার ইচ্ছে ছিল ওয়াওমিং বা অরেগনে শিফট করার, ওখানে একই দামে অনেক বড় প্রপার্টি হত, হয়তো পার্সোনাল ওয়াটার বডিজও থাকতো।"

এরিনা হেসে ফেলে, "এই তিন একর জমি নিয়েই হিমসিম খাচ্ছি, তিনশো একর হলে সামলাত কে?"

সোমনাথ বলে, "আবার ঘুরেফিরে সেই এক তর্ক। লোক রাখতাম। জয় থাকতো আমাদের সঙ্গে। তিন একর জমি দেখেই অরগ্যানিক ভেজিটেবলের ব্যবসার চিন্তা করছিল জয়। জমির মাপ বড় হলে ব্যবসার মাপও বড় হত, জয়ের চাকরির প্রয়োজন পড়তো না।"

এরিনার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, "তোমার চিন্তাধারা সেই একই রয়ে গেল সোমা। আসলে তুমি বড় হয়েছ যেরকম ফ্যামিলি স্ট্রাকচার দেখে, বাবা-মা আর সন্তানেরা এক ছাদের নীচে বাস করে, এখানেও সেটাই তোমার প্রত্যাশা।"

সোমনাথের চোখেমুখে ব্যগ্রতা ফুটে ওঠে, "একটা বড় প্রপার্টি দেখবো রিনা? বলা তো যায় না, হয়তো জয় থেকে গেল আমাদের সঙ্গে? হয়তো জুলি আর মিলিও চলে এলো?"

এরিনার গলায় বিরক্তি, "বড় প্রপার্টি নিলেই জয় আমাদের সঙ্গে থাকবে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। নার্সিং ছেড়ে ফুল টাইম অরগ্যানিক ভেজিটেবলের ব্যবসা শুরু করতে পারে, কিন্তু এক বাড়িতে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। আর জুলি তো মলয়ের সঙ্গে লসএঞ্জেলসে সেটল করে গিয়েছে।"

বিয়ারের ক্যানের তলানিটুকু গলায় ঢেলে সোমনাথ বলে, "আর মিলি মেলবোর্নে।"

সোমনাথ আর এরিনার মেয়ে এমিলি আছে অস্ট্রেলিয়ায়, মেলবোর্ন ইউনিতে আর্ট এন্ড কালচার নিয়ে পড়ছে। সেখানেই আলাপ হয়েছে সমবয়সী হ্যারির সঙ্গে। হ্যারির প্রপিতামহ একটা বিরাট স্টেট কিনেছিলেন মেলবোর্নে। কর্মসূত্রে হ্যারির বাবা-মা আছেন অন্য শহর, অ্যাডিল্যাডে। এখন ওই অত বড় স্টেটে এমিলিকে নিয়ে একা হ্যারি থাকে।

এরিনা মাথা ঝাঁকায়, "মিলি ভালো আছে, শী ইজ এনজয়িং হার স্টাডিজ। হ্যারি ইজ আ কেয়ারিং ম্যান। হ্যারির সঙ্গে মিলি সেটল করলে মন্দ কী!"

সোমনাথের গলা উদাস শোনায়, "না, কিছু না। মেয়েটা দূরে চলে গেল, এই যা।"

এরিনা বলে, "তাতে কী? তুমিও তো ইন্ডিয়া থেকে অ্যামেরিকায় এসেছিলে সোমা?"

এরিনার সঙ্গে তর্ক করে না সোমানাথ, শুধু মনে মনে ভাবে, এগজ্যাক্টলি, সেইজন্যই ছিন্ন মূলের ব্যথা সে জানে। এমনিতেই শৈশব এক ওয়ান ওয়ে দ্বীপ, যেখান থেকে বেরিয়ে এলে আর ফেরা যায় না। আর মূল উৎপাটিত হলে শৈশবের সম্পর্কগুলোও আলগা হয়ে যায়। তখন জীবন নদীতে অবস্থানটা দাঁড়ায়, এক নোঙর বিহীন নৌকোর মত। নৌকো ভাসছে, এদিক-ওদিক ঘুরছে, ঢেউয়ের তালে নাচছে, কিন্তু দু-দণ্ড জিরোতে তরী তীরে ভেড়াতে পারছে না, অনবরত খুঁজেই চলেছে কিছু।

রেডউড-ট্রির সটান কাণ্ড বরাবর সোজা উপরে তাকায় সোমনাথ, এখন ঝকঝকে নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিকে চোখ রেখে সে স্বগতোক্তি করে, "আহ, কী সুন্দর!"

সোমনাথের স্বরে খুশির আমেজ লক্ষ্য করে এরিনা মনে মনে হাঁফ ছাড়ে। মাঝে মাঝে কী যে হয়ে যায় সোমার! তখন সোমনাথকে খুব অসুখী দেখায়। আর এরিনা পড়ে অস্বস্তিতে। মনে হয় সোমার সুখের অভাবের কারণ বুঝি এরিনা নিজে।

অবশ্য একদিন সোমনাথ বলেছিল, "সুখের অভাব নয় রিনা, এ হল প্রিয় কিছু বিয়োগের ব্যথা, কখনওবা পুরোটাই একাকীত্ব।"

এরিনা বলেছিল, "ইট ইজ কমন সোমা, প্রত্যেকেরই মাঝে মধ্যে ওরকম হয়। তবে মুড-সুইং ব্যাপারটাকে অত প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার কী।"

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে সোমনাথ তাকায় এরিনার দিকে, চনমনে ভঙ্গীতে বলে, "এ বছর গ্র্যান্ড খ্রিস্টমাস পার্টির প্ল্যান করো তো। জুলি আর মিলিকে এখন থেকেই বলে দাও, জুলি যেন মলয়কে নিয়ে আসে, আর মিলি হ্যারিকে। জয় তো ভ্যালিতেই আছে।"

এরিনা মৃদু হাসে, "ঘুরেফিরে সেই ফ্যামিলি, ছেলেমেয়ে। কেন, খ্রিস্টমাস উপলক্ষ্যে আমরা দুজনে কোথাও বেড়াতে যেতে পারি তো।"

সোমনাথ মিইয়ে যায়, "শুধু আমরা দুজন? কোথায় যাবো? সারা পৃথিবীই তো ঘোরা হয়ে গিয়েছে।"

এরিনার যেন কিছু মনে পড়ে, সে বলে, "চলো কোলকাতা যাই। হাওড়া ব্রিজ, গঙ্গা নদী, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আরও একবার দেখে আসি।"

সোমনাথের স্বরে বিষণ্ণতা, "কোলকাতায় কেন যাব? মা-বাবা চলে গেছেন। আর কে আছে সেখানে?"

এরিনা কৌতুক করে, "কেন শাশ্বতী, তোমার প্রথম প্রেম। তোমার থেকে টুকরো টুকরো গল্প শুনে শাশ্বতী সম্পর্কে আমার বেশ স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কোলকাতা দেখার সঙ্গে শাশ্বতীকেও দেখে আসবো।"

সোমনাথ জোরে হেসে ওঠে, "ধুর, সেসব অল্প বয়সের ছেলেমানুষি, পুরোটাই মজার।"

এরিনা গম্ভীর গলায় বলে, "পুরোটাই কি মজা সোমা? সত্যি বলছ তুমি? আমার তো মনে হয় শাশ্বতীকে তুমি আজও ভুলতে পারোনি। এখনও তুমি ভালোবাসো শাশ্বতীকে বা শাশ্বতীর স্মৃতিকে। আমি তা ভীষণভাবে টের পাই।"

অকস্মাৎ এরিনার অভিযোগে সোমনাথের চোখ নিচু হয়ে যায়, সে অহেতুক ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ-পায়ের পাতা চুলকোতে শুরু করে।

এরিনা বলে, "বছরের পর বছর আমার সঙ্গে সহবাস করলে, তোমার তিন ছেলেমেয়ের মা আমি, তবু তেমন করে আমাকে ভালবাসতে পারলে না কেন?"

সোমনাথকে অসহায় দেখায়, "তোমাকে আমি ঠকাইনি রিনা। আমাদের সন্তানেরা ভালোবাসার সন্তান। শাশ্বতীর সঙ্গে আমার তো কোনরকম যোগাযোগ নেই।"

এরিনা তার মাইনাস-ফাইভ পাওয়ারের চশমার পিছন থেকে চোখ তুলে তাকায়, "যোগাযোগ নেই বলেই তো মোহ থেকে গেছে, বর্তমানের এরিনাকে ক্রমাগত ফাইট করতে হচ্ছে অতীতের শাশ্বতীর সঙ্গে। আচ্ছা, শাশ্বতী কি খুব সুন্দর? তোমার কবিতার সেই মেয়েটির যেমন পাখির নীড়ের মত চোখ?"

এরিনাকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে কাছে টেনে নেয় সোমনাথ, "শাশ্বতীর রূপ অত মহান কিছু নয়, প্রথম সম্পর্ক তো, তাই কষ্ট হয়েছিল বেশি। বাট আই অ্যাম হ্যাপি রিনা, এমন সুন্দর তিন সন্তান আমার।"

এরিনা জিজ্ঞাসা করে, "আর আমি? তোমার জীবনে আমার অবস্থান কোথায় সোমা?"

এরিনাকে আরও কাছে টেনে নেয় সোমনাথ, এরিনার কপালে আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে, "তুমি ছাড়া আমি নেই রিনা। সোমনাথ ডাজনট এক্সিস্ট উইদাউট এরিনা!"

নিজের পিঠ থেকে সোমনাথের হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে এরিনা উঠে দাঁড়ায়, একটু উঁচু গলায় বলে, "অনেক প্রেম হয়েছে, নাউ লেটস গো। আজ আর পুলে নামবো না, বাড়িতেই শাওয়ার নেব। তাড়াতাড়ি চলো, লাঞ্চ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

(চলবে)

স্বপ্না মিত্র একজন প্রবাসী বাঙালি। বিজ্ঞানের ছাত্রী। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রেডিও-ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি-টেক করে বেশ কিছুদিন দেশি এবং বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। চিরদিনই হার্ডকোর হবি ছিল রিডিং, লেখালেখি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গা। ইদানীং বেশ কিছু লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে (দেশ, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্তমান, আনন্দমেলা, বাংলা ফেমিনা, আনন্দবাজার, আজকাল), বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং বই হিসেবে।

মহাদেশে মহাদেশে সেতুবন্ধন – এ শব্দগুলোর একটা গাম্ভীর্য আছে। আছে গভীরতা আর ভার। মনে আসে মহতী চিন্তা। ভাল কাজ করার ইচ্ছে জাগে। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে লাগে সৎ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কোন একজনের নয় – একাধিক মানুষের। "বাতায়ন" গোষ্ঠী নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে এই কাজ। পার্থ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি অনুষ্ঠান – "The Bard of Bengal" – 'বাতায়ন' ও WA Poets এর যৌথ উদ্যোগে। এই "Bard" আমাদের রবি ঠাকুর। পরিবেশিত হল রবীন্দ্রনাথের গান, নাচ, কবিতা ও আলোচনা। শ্রোতাদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা বাংলা নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে অবগাহনের এই সুযোগটুকু তাঁদের দিতে পেরে আমরা ধন্য। 'বাতায়ন তার সীমিত সাধ্য নিয়ে লক্ষ্যে স্থির'। কি সেই লক্ষ্য ? তা হল বিশ্বের নানা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে চিন্তা ও ভাবের আদানপ্রদানের একটা সাঁকো তৈরী করা – তা সে যত সরু সাঁকোই হোক না কেন। বিভেদের মাঝে এই মহান মিলনের ভাবনার আদর্শ কবিগুরুর। সেই আদর্শেই আমাদের এই পথ চলা।

পার্থ পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যালে শ্রীজাত

২০২৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর 'বাতায়নে'র সহযোগিতায় WA Poets এর আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করতে পার্থ-এ আসেন কবি শ্রীজাত। অস্ট্রেলিয়ার কবিতা উৎসবে বাংলার কবির অংশগ্রহণ এই প্রথম। অনুষ্ঠানে শ্রীজাত'র কবিতা ও তাঁর অনুবাদ পাঠ, তাঁর সাথে নানা আলাপচারিতা ও প্রশ্ন উত্তরের আড্ডা – সব অনুষ্ঠানই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

সেপ্টেম্বর ২০২৩ শে "বাতায়ন"-এর উদ্যোগে ও কবি শ্রীজাত'র পরিচালনায় অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কবিতার ওয়ার্কশপ। "কবিতা কি ও কেন" মূলতঃ এই সূত্র ধরে কবি আলোচনা করেছিলেন কবিতার বিভিন্ন আঙ্গিক ও তার বিন্যাসের ওপর এই মনোজ্ঞ ওয়ার্কশপে। সমৃদ্ধ হয়েছিল অংশগ্রহণকারীরা।

পার্থ-এ বাঙালীদের সাথে আনুষ্ঠানিক সন্ধ্যা।

পার্থ পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যালে
তন্ময় চক্রবর্তী

২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়াতে আয়োজিত Perth Poetry Festival – এ আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন বাংলার কবি ও সাহিত্যিক শ্রী তন্ময় চক্রবর্তী। এই আমন্ত্রণ ও আয়োজন ছিল **বাতায়ন** এবং **WA Poets** এর যৌথ উদ্যোগ। অ-বাংলাভাষীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি ভূমিকা পালন করেছেন কবি তন্ময়। আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহন করেন তিনি এবং বিভিন্ন ভাষার বিদেশী কবিতার অনুবাদ ও নিজের কবিতা পাঠ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন ।

Perth-এর ৩০০ কিলোমিটার দূরে Margaret River Town Library-তে আরও একটি কবিতার আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল কবি তন্ময় চক্রবর্তীকে নিয়ে। নান ভাষার কবিতা পাঠ ও গানের মধ্যে কবি তন্ময় একটি মনমাতানো অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন ।

Book Review

These Precious Days — Ann Patchett

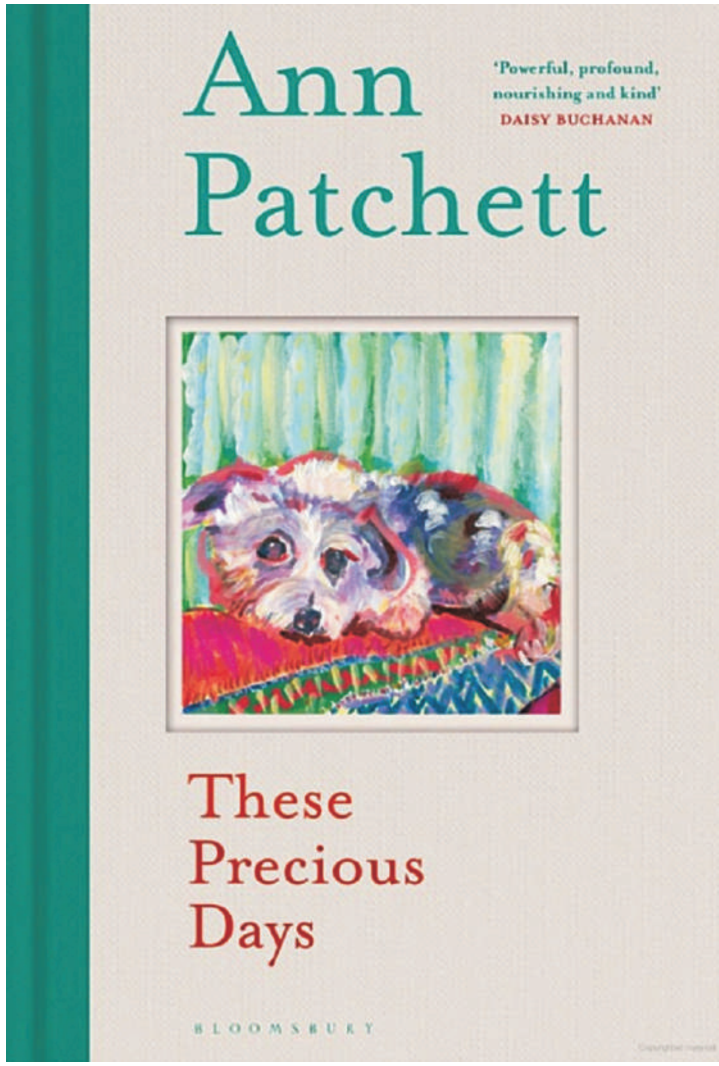

বৃহস্পতিবার দুপুরের নিয়মমাফিক মিটিং শেষ। মিটিং ঘরের বাইরে বেরোতেই এক সহকর্মী এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। হাতে একটি বই। সামান্য সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "আমি একজনকে এই বইটা পড়তে দিতে চাই। তোমার বইপড়ার অভ্যেস আছে জানি। তুমি পড়বে please বইটা?"

তৃষ্ণার্ত কোন মানুষকে যদি কেউ এক গ্লাস সুশীতল জল এনে জিজ্ঞাসা করে যে সে জল পান করবে কিনা এ হল অনেকটা সেইরকম। কেউ আগ্রহ করে নিজের ভাললাগা বইটি পড়াতে চাইছেন। সহকর্মীর প্রশ্নের উত্তরে তাই হ্যাঁ ছাড়া যে অন্য কিছু বলা যেতে পারে একথা মাথাতেই আসে নি। ভারী ভাল হল তাতে। চমৎকার একটি বই পড়লাম। নাম These Precious Days, লেখিকা Ann Patchett. ছোট প্রবন্ধের সংকলন একটি। লেখকের অন্যান্য উপন্যাস (তার মধ্যে Bel Canto সবথেকে ভাল লেগেছিলো) পড়েছিলাম। কিন্তু প্রবন্ধ পড়িনি। ঝরঝরে ভাষা। রচনাগুলি মূলত আত্মজীবনীমূলক হলেও কিভাবে যেন ব্যক্তিজীবনের পরিসর ছাড়িয়ে যায়। পাঠক নিজের অভিজ্ঞতাও অনুভূতির প্রতিফলন দেখেন লেখাতে। তাই লেখক-পাঠক সংযোগ তৈরী হতে বিলম্ব হয় না মোটেও। বইয়ের শেষের দিকে একটি প্রবন্ধ "A Talk To The Association Of Graduate School Deans" আর সেখানে দু-তিনটি বাক্য মনের গভীরে প্রবেশ করল। তিনি লিখছেন,

"I promote the books I love tirelessly, because a book can so easily get lost in the mad shuffle of the world and it needs someone with a loud voice to hold it up praise it. I am that person. As every reader knows, the social contract between you and a book you love is not complete until you can hand that book to someone else and say,' Here, you're going to love this."

এ যেন বইপ্রেমীদের ইস্তেহার। সত্যিই তো – আমাদের অস্থিরতায় আর ব্যস্ততায় ভরা জীবনে বইএর কথা মনে রাখা কি সহজ? বই তাই হারিয়েই যায়। যে বই পড়ে ভাল লাগে সেটির কথা বারেবারে বলা ও অন্যান্য গ্রন্থভক্তদের সেটির কথা জানান -এটুকু দায়বদ্ধতার প্রত্যাশা নিষ্ঠাবান পাঠকদের কাছে করাই যায়। বেঁচে থাকে বই। আর ভাল বই পড়ে মনের আনন্দে বাঁচুন সকলে।

A Gentleman In Moscow — Amor Towles

রাশিয়া দেশটি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আমার ছোটবেলায় সে দেশকে বলা হত সোভিয়েত রাশিয়া বা সোভিয়েত দেশ। সত্তরের দশকের শেষাশেষি ও বিশ্বায়নের এমন রমরমা ছিল না। সোভিয়েত দেশের সঙ্গে আমার পরিচয়ের যোগসূত্রটি ছিল বইমেলায় 'ভস্তক' এর স্টল। ব্যাস, ঐটুকুই। যতদিন না ক্লাস এইট, নাইন-এ উঠি ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েত দেশ মানেই তাই দৃষ্টিনন্দন কিছু বই। সুন্দর কাগজ, চমৎকার বাঁধাই আর ঝকঝকে ছাপা। গোগোল নামটা অবশ্য পরিচিত ছিল। তার কারণ দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত বড় আর বাঁধানো পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত সমরেশ বসুর ছোটদের জন্য লেখা রহস্য গল্পগুলি। সেসব গল্পের মূল চরিত্রের নাম গোগোল। একটু অন্যরকম নাম। মাকে এ নামের মানে জিজ্ঞাসা করতে মা বলে দিয়েছিলেন গোগোল হলেন রুশ দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তলস্তয়, পুশকিন, চেকভ – তাঁদের সঙ্গে পরিচিতি অনেক পরে। তবে রাশিয়া সঙ্গে থেকেই গেছে কোন না কোনভাবে মনের অবচেতনে।

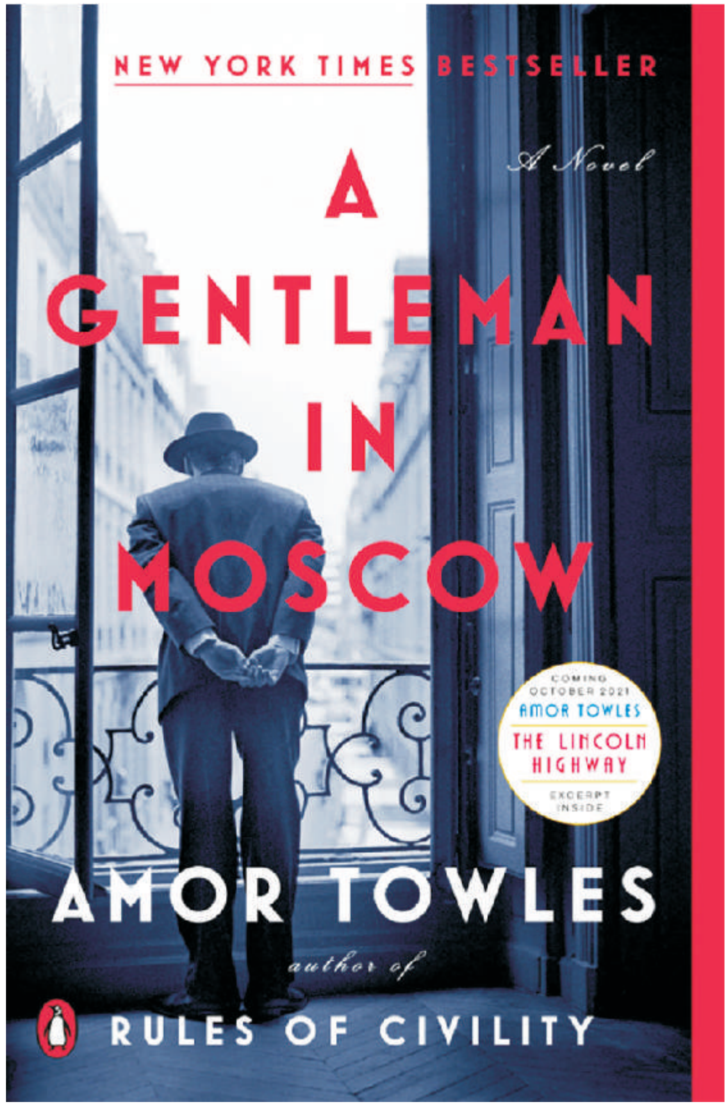

A Gentleman In Moscow বইটির নাম শুনি আমার এক সহকর্মীর কাছে। আবার রাশিয়া। বই পড়ার ঝোঁকটি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আমার মা এর কাছ থেকে। আমার কন্যেটিও পেয়েছে তার মা, দিদার কাছ থেকে। বইয়ের নামটি শোনার কিছুদিন পরে দেখি আমাদের বসার ঘরের টেবিলে সে বই। ব্যাপার কি ? জানা গেল মেয়ে সে বই কিনে এনে শুরু করেছিল পড়তে। কিন্তু কিছুটা পড়ে থেমে গেছে। সেটা প্রায় ২০২০র মাঝামাঝি। অতিমারীর প্রকোপে গৃহবন্দী আমরা। এই বন্দীদশার সঙ্গে নাকি বইয়ে বর্ণিত পরিস্থিতির কিছু সাদৃশ্য আছে। তাই পাঠ আর এগোয় নি তার। এবারে আমি শুরু করলাম পড়তে।

১৯২২ সাল। Count Alexander Ilyich Rostov এর বিচার হচ্ছে বলশেভিক ট্রাইবুনাল এ। তাঁর অপরাধ হল বিপ্লববিরোধী একটি কবিতা লেখা। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। কিন্তু তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ বিপ্লবীদের (তাঁদের কেউ কেউ আবার এখন বড় দরের দেশ নেতা) মধ্যে তাঁর বেশ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী আছেন। পরিবর্তে তাঁকে যাবজ্জীবন গৃহবন্দিত্বের শাস্তি দেওয়া হল। পাঠান হল Metropol হোটেলে। আর Count Rostov এর সঙ্গে পাঠকেরাও প্রবেশ করল সেই হোটেলে। পরবর্তী ত্রিশ বছর থেকেও গেল তারা সেখানে। Hotel Metropol তার অতিথি, কর্মচারী, বলরুম, অতিথিদের থাকার ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা, কার্পেট – সবকিছু নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল বইয়ের

পাতায় পাতায়। ক্রমশঃ বড় থেকে আরও বড় হয়ে উঠল Metropol. শুধু setting নয়, হয়ে উঠল এ কাহিনীর বিশেষ এক চরিত্র। ইতিমধ্যে স্তালিন জমানায় বাইরে চলেছে ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত – দুর্ভিক্ষ, সাইবেরিয়া প্রেরণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – রাশিয়া কৃষিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে শিল্পনির্ভর দেশ হওয়ার পথে হাঁটছে। বৈপ্লবিক বদল ঘটে যাচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। সাহিত্যের দুনিয়ায় তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে।

"Bulgakov had not written a word in years. Akhmatova had put down her pen. Mandelstam, having already served his sentence, had apparently been arrested again. And Mayakovsky ?" Metropol এর দরজা খোলা বন্ধ হওয়া আর অতিথিদের আসা যাওয়ার সাথে সাথে এ সবকিছুর আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। পড়তে পড়তে নিজেদের পরিবেশ ভুলে যেতে হয়। যেন Kremlin এর উল্টোদিকে Metropolই আমাদের ঘরবাড়ী। Count তো বটেই, Anna Urbanova, Nina, Andrey – সকলকেই মনে হয় কত চেনা।

এই কাহিনীর নায়ক Alexander Rostov এক আশাবাদী চরিত্র। গল্পের কথকও তিনি। তাই ইতিহাসের অন্ধকার সময়ও পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে না। কাহিনী এগিয়ে চলে সজীব, সরস ভঙ্গিমায়। Metropol এর বাইরে তৎকালীন রাশিয়ার ঘটনাবলীর সঙ্গে সমতা রাখার জন্য লেখক Amor Towles ভারী দক্ষতার সঙ্গে একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে হাজির করেছেন বইতে। তার উপস্থিতি শুধু লম্বা লম্বা পাদটীকায় (footnote)। সে চারপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তার বক্তব্য রাখছে। Count এর আশাবাদের বিপ্রতীপে তার কণ্ঠে cynicism সুস্পষ্ট।

বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা এককথায় মনে দাগ কাটার মতো। বেশ অনেকদিন পরে এমন একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়লাম যেটি আবার একবার পড়ার ইচ্ছে রইল। উপরি পাওনা ? রাশিয়ান ক্লাসিক্সগুলি ঘুরে দেখার তীব্র আগ্রহ। A Gentleman In Moscow – বইপ্রেমী বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধ পড়ার জন্য। বইয়ের প্রচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জার সঙ্গে কিন্তু ছোটবেলায় কেনা 'ভস্তক' থেকে প্রকাশিত 'রুশ দেশের উপকথা'র বিশেষ মিল নেই। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? বই যে সবসময় তার প্রচ্ছদ দিয়েই বিচার করতে হবে এমন কোন কথা নেই, সে যে যাই বলুন না কেন।

– রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

বাতায়নে প্রকাশিত বই